মান্ধাতার টোপ
ও ঘনাদা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্লি সিওসরাস নামের যে-সামুদ্রিক প্রাণীটি অন্তত দশ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে, তার হদিশ ফের কীভাবে মিলতে পারে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের এক পাহাড়ী হ্রদে—এর উত্তর খুব ভাল করেই জানেন একজন।
সেই অদ্বিতীয় মানুষটি আর কেউ নন, স্বয়ং ঘনাদা।
শুধু তাই কেন, স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের এই সামুদ্রিক প্রাণীটি কীভাবে এক জলচর দানব-রূপে সারা পৃথিবীর রহস্য, কৌতূহল ও অনুসন্ধানের বিষয়, কীভাবে এর রহস্যভেদের সংকেত লুকনো ছিল গীতগোবিন্দের এক শ্লোকে—তাও ঘনাদার অজানা নয়।
সাধে কি আর জানেন ঘনাদা ? আসলে তাঁকে যে প্রকারান্তরে জড়িয়েই পড়তে হয়েছিল এক বিরাট রহস্যভেদের জালে। আর সেই শ্বাসরোধী অভিজ্ঞতাই বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়িতে বসে এবার শুনিয়েছেন ঘনাদা।
কল্পবিজ্ঞানের সেই কাহিনী পদে-পদে এমনই রোমাঞ্চ ও উত্তেজনায় ঠাসা যে মনে হবে এক দুর্দান্ত রহস্য কাহিনীই বুঝি শুনিছি।

১০·০০

ISBN 81-7066-070-X

মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা

মান্ধাতার টোপ ও ঘনাদা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ দেবাশিস দেব

ISBN 81-7066-070-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম
কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০

পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু
শ্রীশান্তিলাল মুখোপাধ্যায়কে

এই লেখকের অন্যান্য বই

যাঁর নাম ঘনাদা

ঘনাদার ফুঁ

তেল দেবেন ঘনাদা

ছড়া যায় ছড়িয়ে

ঘনাদা তস্য তস্য অম্‌নিবাস

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্...

প্রথম মহাপ্রলয়ের বন্যায় সমস্ত সৃষ্টিকে যিনি চরম বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছিলেন, সেই মৎস্যাবতারের যথার্থ পরিচয় বিজ্ঞান কি আজও জানে ?

সেই মৎস্যাবতার স্বয়ং যদি আদি মনুর রক্ষক হন, তা হলে একমাত্র মান্ধাতার 'টোপ'ই তাঁকে ধরবার যন্ত্র নয় কি ?

কে সেই আদি মৎস্যাবতার ? মান্ধাতার টোপের রহস্যই বা কী ? এসব অতল রহস্যের মীমাংসা যথাস্থানে ও যথাসময়ে হবে আশা করে, আর কেউ নয়, স্বয়ং ঘনাদার বিরামহীন আলাপন এবার শোনা যেতে পারে বোধহয় ।

হ্যাঁ, আমাদের সকলকে বিস্মিত বিহ্বল করে তিনি সম্প্রতি দাঁড়ি-কমা-ছেদহীন যে ভাষণ দিয়ে চলেছেন, কোনও দিক দিয়ে তার কোনও কূলকিনারা না পেয়ে আমরা সত্যিই দিশেহারা ।

বোঝাসোঝার চেষ্টা না করে সেই কলস্বর-প্রবাহে ভেসেই না হয় যাওয়া যাক !

ঘনাদা বলে যাচ্ছেন :

"তা আমার কাছে কেন ? শার্লক হোমস না হয় নেই, কিন্তু অ্যারকিউল পোয়ারোর কাছে গেলেই তো পারতেন ? আর তা-ও না পেরে উঠলে পেরি ম্যাসনকে ভুলে গেলেন কেন ?

"বলতে গেলে সারা দুনিয়া তন্নতন্ন করে খুঁজে ভূমধ্যসাগরের এই নিতান্ত খুদে আর তখনকার প্রায় অজানা নির্জন দ্বীপে ভাড়া-করা জেলে-নৌকোয় কোনওক্রমে যাঁরা আমার সন্ধান করে এসে নেমেছেন, তাঁদের মুখে প্রথমে কোনও কথাই নেই ।

"আমার গলার স্পষ্ট বিরক্তিতে বেশ একটু বেসামাল হয়ে দুই নতুন আগন্তুকের মধ্যে বয়স যাঁর একটু বেশি, সেই রোগাটে চিম্‌সে চেহারার টাক-মাথা মানুষটি আমতা-আমতা করে বললেন, 'আজ্ঞে, দেখুন…মানে…'

"'আজ্ঞে দেখুন…অর্থাৎ কি না…মানে…ওসব বুকনি ছেড়ে একটু ঝেড়ে কাসুন দেখি।' একটু ধমকে দিয়েই এবার বললাম, 'ব্যাপার যা বুঝছি, তাতে মনে হচ্ছে হঠাৎ গা-ঢাকা-দেওয়া দুনিয়ার এক সেরা ধাপ্পাবাজকে হন্যে হয়ে আপনারা খুঁজছেন। কিন্তু তাকে খুঁজতে দুনিয়ার সব বাঘা-বাঘা ফাট্‌কা বাজার ছেড়ে আমার কাছে কেন ?'

"'তোর কাছে কেন ? শোন তবে উচ্চিংড়ে !' দুই আগন্তুকের মধ্যে বয়সে যে ছোট, কিংকং-এর ছোট ভাইয়ের মতো চেহারার সেই দৈত্যটি আমার একটা হাত মুচড়ে ধরে এবার বললে, 'শোন্ তবে তেলাপোকাটা, দুনিয়ার টিকটিকি-মহলে মস্ত এক ঝানু ঘুঘু বলে তোর নাকি দারুণ সুনাম ! তাই তোকে আমাদের মক্কেলকে এক মাসের মধ্যে খুঁজে বার করবার হুকুম দিতে এসেছি। পারিস যদি তা হলে একটা মেডেলই হয়তো পেয়ে যাবি, আর না পারলে গর্দানটাই দেব মটকে। বুঝলি ?'

"বাঃ, বাঃ। মনে-মনে তখন আমি যে দারুণ খুশি হয়েছি, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। মৎস্যাবতারের আশায় ক'বছরের আজব এক তল্লাশির টহলদারিতে কখনও জেলেদের, কখনও সাধারণ ব্যবসায়ীদের ডিঙিতে আর সুলুপে ঘুরতে-ঘুরতে নেহাত নরম-নরম মানুষজনের সঙ্গে দিন কাটিয়ে হাত-পা'গুলোয় যখন বাত ধরে গেছে, তখন একটু হাত-পা নাড়াচাড়া করতে পারলে যেন বাঁচি।

"কিংকং-এর ছোট ভাই তখন দাঁতে দাঁত চাপা গলায় বলে যাচ্ছেন, 'তা আমাদের কথায় একটু কান দেবেন, না একটার বদলে দুটো কানই মেরামতের জন্যে আমরা ছিঁড়ে নিয়ে যাব ?'"

ওপরে যে বাক্যালাপের বিবরণটুকু এ-পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, তা যে আমাদের এই কলকাতা নগরীর বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের ঠিকানায় একটি নাতিজীর্ণ নাতিনবীন আড়াইতলা বাড়ির একটি বিশেষ আড্ডাঘরে ছাড়া আর কোথাও হতে পারে না, এবং সে-বিবরণদাতা যে স্বয়ং তেতলার টঙের ঘরের তিনি, মানে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘনাদা ছাড়া

আর কারও হওয়া সম্ভব নয়, সে-কথা বিশদ বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নিশ্চয় নেই।

হ্যাঁ, বিবরণ যা শুনছি তা স্বয়ং ঘনাদাই দিচ্ছেন। শুধু তাই নয়, দিচ্ছেন প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে বলা যেতে পারে। দিনের পর দিন সাধ্যসাধনা করে বড়-রাস্তার মোড়ের বড় হালুইকরের ক্ষীরের পান্তুয়া-লেডিকেনি থেকে শুরু করে চৌরঙ্গিপাড়ার সেরা মোগলাই পরোটা আর মুরগমসল্লমের ঘুষ দিয়ে যাঁকে দিয়ে এক-এক সময় একটা অব্যয় শব্দও বলানো যায় না, সেই ঘনাদার এ কী অবিশ্বাস্য রূপান্তর ! আজকের বিকেলের আড্ডা-ঘরে আর কেউ আসবার আগেই ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ি দিয়ে রেডিওর সিগন্যাল টিউনের মতো তাঁর বিদ্যাসাগরী চটির স্বাক্ষর চটপটি ধ্বনি তুলে নিজের মৌরসি কেদারাটি দখল করে সবাই এসে হাজির হবার আগেই একনাগাড়ে সেই যে বলে চলেছেন, তার আর বিরাম নেই। বলা মানে একেবারে লাগাতার, যেন এক নিশ্বাসে বলা। আর সে-বলায় থামলে যেন কেউ তাঁকে কোতল করবে, এমনই তাঁর অস্থিরতা।

কিন্তু বলছেন তিনি কী ? আর কী নিয়ে ?

শ্যামবাজারে গল্প শুরু করে হঠাৎ টালা হয়ে একেবারে নিউ আলিপুর গেলেও তবু তার মধ্যে কিছু মানে থাকতে পারে, কিন্তু এ যে জামতাড়া দিয়ে শুরু করে পাজামার কথায় জড়িয়ে পড়ে জামরুল কিনতে ছোটা !

কত কী-ই না তিনি আমাদের এর মধ্যেই শুনিয়েছেন ! এক কথায়, কোথায় না নিয়ে গিয়েছেন !

আরম্ভই করেছিলেন, নরেশ্বর নামটা শুনে একেবারে নরওয়ের উত্তরে পোলার বিয়ার মানে সাদা ভাল্লুকের জন্যে চোখের জল ফেলে।

"থাকবে না, থাকবে না !" প্রায় চাপা কান্নার সুরে বলেছিলেন, "নরওয়ের ওই কড়া আইন সত্ত্বেও সাদা ভাল্লুক সেখানে কেন, দুনিয়াতেই আর থাকবে না। এখন অবশ্য সারা বছরে গোনাগুনতি ক'টি মাত্র মারবার অনুমতি দেওয়া হয় শিকারিদের। কিন্তু চোরাশিকারিরা লুকিয়ে লুকিয়ে ছাল পাচারের লোভে আরও কত অমন মেরে শৌখিন মেরু-টহলদারদের খুদে প্লেনে সরিয়ে ফেলছে, কে তার হিসেব রাখে ! তাই বলছি, নরওয়ের কথা আমায় ভাই বোলো না। বড় আফসোস হয়।"

"না, না। নরওয়ের কথা বলিনি আপনাকে," শিশির সংশোধনের চেষ্টা

করে বলেছিল, "বলছিলাম ওঁর নাম হল নরেশ্বর। উনি..."

আর বেশি কিছু বলবার ফুরসত পায়নি শিশির। ঘনাদা তখন নরওয়ের সাদা ভাল্লুক ছেড়ে একেবারে নামাবলির রহস্য নিয়ে মেতে উঠেছেন।

"নাম ? নামের মজার কথা যদি বলতে হয়," ঘনাদা নামকীর্তনের মতো গদ্‌গদ হয়ে বলতে শুরু করেছেন, "তা হলে দুনিয়ার সেই সবচেয়ে সৃষ্টিছাড়া আজগুবি নামটার কথাই বলতে হয় নিশ্চয়। সেই আজগুবি, কিন্তু মিথ্যে ধাপ্পা-টাপ্পা কিছু নয়, সত্যিকার একটা ছাপার অক্ষরে ছাপা সাইনবোর্ডে জ্বলজ্বলে করে লেখা নাম। খুব বেশি নয়, মোট আটান্নটি অক্ষর সে নামের। নামটা আর কিছুর নয়, একটা রেল স্টেশনের। জংশন-টংশন গোছের বড় স্টেশন নয়, নেহাত খুদে একটা সামান্য স্টেশন। ইউরোপ, আমেরিকা, চীন কি রাশিয়ার বিরাট কোনও রেললাইনেরও নয়, জায়গাটা বিলেত হলেও তার মফস্বলের মফস্বল ওয়েলসের একটা লেভেল ক্রসিংয়ের চেয়ে মান্যে বড় কিছু নয়। কিন্তু সেই বিলেতি ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের নাম কি একখানা ! কী, মনে পড়ছে নিশ্চয় নরহরিবাবুর ?"

ঘনাদার দৃষ্টিটা এবার সোজাসুজি নরেশ্বর বলে শিবু যাকে পরিচিত করতে চেয়েছিল, সেই বেশ একটু যেন ঘামতে শুরু করা, মোটাসোটা নিরীহ চেহারার ভদ্রলোকের দিকে।

ঘনাদার আজকের এতক্ষণের বল্গাছাড়া বাক্-বিস্তারের রহস্যের খেই কি এখানে আছে মনে হয় ?

তা নিয়ে ভাববার ফুরসত তখন আর মেলেনি। ঘনাদা তাঁর দৃষ্টি আবার আমাদের সকলের উপর বুলিয়ে নিতে-নিতে যেন একটু লজ্জিতভাবে বলেছেন, "আমারই কি আর সব ঠিক মনে পড়বে ? এক-আধটা তো নয়, পুরো আটান্ন হরফের নাম। আর সে এমন ভাষায়, যাতে বেশিদিন কথা বললে মাথায়-জিভে জট পাকিয়ে ঘিলুতেই গোলমাল হয়ে যায় মনে হয়। তবু..."

"মানে !" আবার আমাদের সবিস্ময় জিজ্ঞাসা, "সেই আটান্ন হরফের স্টেশনের নামটা আপনার মনে আছে নাকি ?"

"থাকা কি আর সম্ভব ?" ঘনাদা কেমন একটু তাল ঠোকার ভঙ্গিতে শিবুর আনা অতিথি নরেশ্বরবাবুর দিকে চেয়ে তারপর যেন গলায় কিছুটা

বিনয়ের সুর আনবার চেষ্টা করে বললেন, "তবু দেখি একবার চেষ্টা করে। এই যেমন..."

ঘনাদা একটু থামলেন। আমরা সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর মুখের দিকে তখন তাকিয়ে।

কী করবেন এবার ঘনাদা ?

সত্যি-সত্যি রামধাপ্পা দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে মগ্‌ডাল থেকে মুখ থুবড়ে পড়বেন নাকি মাটিতে ?

ধাপ্পায় উনি ধুরন্ধর, এ-কথা মেনে নিয়েও বলি, সব গুলবাজিরই যে একটা সীমা আছে, তাও তো ওঁর জানা উচিত !

বিলেতের ওয়েলস অঞ্চলের একটা খুদে রেলস্টেশনের যে শুধু দাঁত-ভাঙা নয়, পুরোটা বলতে দম ফুরিয়ে যাবার মতো একটা নাম আছে, সেই খবরটা কেউ কি আর আমরা শুনিনি ? দু'চারটে নয়, পুরো বানান করে বলতে গেলে তাতে সাতান্ন না আটান্নটা অক্ষর লাগে, তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু তাই বলে সেই আটান্ন অক্ষরের নামটা হরফ ধরে ধরে পুরোটা বলে যাওয়ার স্পর্ধা ?

কী ভেবেছেন ঘনাদা ? ক-এ আকার কা, আর খ-এ আকার খা যাদের কাছে এক, তেমন গোমুখ্যুদের যা শুনিয়ে দেবেন, তাই তারা না মেনে নিয়ে করবে কী ?

কেন, আমাদেরও করবার কিছু নেই নাকি ? আর কিছু না জানি গিনেসের বুক অব রেকর্ডসের নামটা তো অজানা নয়। দেখি না একবার এবার ঘনাদার দৌড়টা। টেবিলের উপর বাজারের হিসেবের খাতাটা পড়ে রয়েছে। সেটাই টেনে নিয়ে ঘনাদাকে একটু উসকানি দিয়ে বললাম, "তা আপনি পারেন নাকি সত্যি ওই আটান্নটা হরফের নামটার কিছুটা অন্তত বলতে ? সব না পারেন, আটান্নর মধ্যে তিন-আটে চব্বিশটা পারলেই বাজিমাত।"

"না, না, চব্বিশটা কেন ? বলতে গেলে পুরো আটান্নটাই না বললে তো বাহাদুরি না করতে যাওয়াই ভাল।" ঘনাদা আমাদের বেশ একটু অপ্রস্তুত করে এই মজলিশে শিবুর আনা আজকের অতিথির দিকে ফিরে বললেন, "কী বলেন নরেশ্বরবাবু ?"

"আজ্ঞে, আমি, মানে..." শিবুর আনা আজকের অতিথি চারবার ঢোক

গিলে কেমন যেন একটু তোতলা হয়ে যা বলবার চেষ্টা করলেন, তা ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারার আগেই ঘনাদা তাঁকে যেন ভুলে গিয়ে নিজের আগের কথাতেই ফিরে গেলেন। বললেন, "হ্যাঁ, পারি না পারি, চেষ্টা তো করে দেখতে দোষ নেই। এই যেমন নামটার প্রথম পাঁচটা অক্ষর হল—এল, এল, এ, এন, এফ।"

ঘনাদার কথা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি বাজারের হিসেবের খাতার একটা সাদা পাতায় অক্ষর ক'টা লিখে নিয়েছি।

এরপর ঘনাদাও যেমন বলে যান, আমিও একনাগাড়ে সব লিখে নিই আমার খাতায়। ঘনাদা কত বড় স্মৃতিধর-বাহাদুর, তার প্রমাণ এই খাতাই এরপর দেবে। গৌর আছে আমার পাশেই বসে। ঘনাদার উচ্চারণগুলো এক-এক করে খাতায় লেখার সময় তা সাক্ষী হিসেবে তাকে দেখিয়ে তো রাখছি আমি।

প্রথম পাঁচটা অক্ষরের পর ঘনাদা তখন বলছেন, এ, আই, আর, পি, ডব্লু, এল, এল, জি, ডব্লু, ওয়াই, এন, জি, ওয়াই, এল, এল, জি, ও, জি, ই, আর, ওয়াই, সি, এইচ, ডব্লু, ওয়াই, আর, এন, ডি, আর, ও, বি, ডব্লু, এল, এল, এল, এল, আই, এ, এন, টি, ওয়াই, এস, আই, এল, আই, ও, জি, ও, জি, ও, জি, ও, সি, এইচ।"

ঘনাদার বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখাও শেষ করে সামনের টেবিলের ড্রয়ারে খাতাটা রেখে দিয়ে একটু বোকা সেজেই বললাম, "এতগুলো অক্ষর তো আউড়ে গেলেন, কিন্তু সেগুলো ঠিক না ভুল তার প্রমাণ তো আর আমাদের হাতে নেই। আবোলতাবোল বলে গেলেই বা ধরব কী করে?"

ধরতে পারা যাবে না বলেই ঘনাদার মুখে একটু বাঁকা হাসি। "আপনি কী বলেন নরোত্তমবাবু?" ঘনাদা আবার সেই শিবুর আনা অতিথির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলেন নরসিংহবাবু, হরফগুলো ঠিক না বেঠিক, তা ধরবার কোনও উপায় নেই?"

শিবুর নিয়ে-আসা নতুন অতিথির এবার প্রায় কাঁদো-কাঁদো মুখ। প্রায় মিনতির সুরে তিনি বলবার চেষ্টা করলেন, "দেখুন, আমি মানে, আপনাকে মিনতি করে বলছি···"

"না, না, মিনতি করবেন কেন?" ঘনাদা ভদ্রলোকের মুখের চেহারা

আর গলার করুণ সুরে এতক্ষণে বুঝি নিজের ধারণা আর ব্যবহার সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে সুর একটু পালটে তাঁকে যেন সাহস দিয়ে বললেন, "যা বলবেন তা একেবারে তাল ঠুকেই বলবেন। বলার মুরোদ যার আছে, যা বলবার, সে তো তা সাহস করে বলবে। বলুন না আপনি, আটান্নটা হরফ, যা শোনালাম, তা প্রলাপ না সাচ্চা বানান, তার হদিস কোথাও মেলা কি সম্ভব ?"

নরেশ্বর বা নরোত্তম, নামটা যাই হোক, শিবুর নিয়ে আসা ভদ্রলোক এবারে মরিয়া হয়েই বুঝি একটু সাহস সংগ্রহ করে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সম্ভব।"

"সম্ভব ?"

আমরা সবাই তো বটেই, স্বয়ং ঘনাদাও এবার বুঝি কেমন একটু চমকিত।

"সম্ভব বলছেন তো আপনি ?" জোর দিয়ে বলার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘনাদার কেমন একটু দ্বিধান্বিত জিজ্ঞাসা, "ঠিকঠাক না আবোলতাবোল বানান বলেছি, তা ধরে ফেলার উপায় তা হলে আছে বলছেন আপনি ?"

"হ্যাঁ, বলেছি।" শিবুর নিয়ে আসা অতিথি নরহরি বা নরেশ্বরবাবু আরও যেন বেপরোয়া হয়ে বললেন, "আর কোথাও না হোক, আপনাদের এখানে শুধু তা কেন, সাপের পাঁচ পা'ও হওয়া সম্ভব।"

সাপের পাঁচ পা ? আমাদের আর বিস্ময়ের ভান করতে হল না এবার।

আমাদের সকলের বক্তব্যই ঘনাদার মুখ দিয়েই বার হল, "সাপের পাঁচ পা ? সাপের পাঁচ পা আবার কোথা থেকে এল ?"

"কোথা থেকে এল ?" নরেশ্বর না নরহরি নামের ভদ্রলোক অনেক সয়ে এবার যেন পুরোপুরি খাপচুরিয়াস, "এল আপনাদের এই গারদ মানে পাগলা-গারদের গুণে। সাপের পাঁচ পা কেন, আপনাদের এই বদ্ধ পাগলের গারদখানায় সবকিছু হওয়া সম্ভব। এখানে যাহা বাহান্ন, তাকে আপনারা তেষট্টি মাত্র নয়, পোস্তার আলুপট্টি করে দিতে পারেন। তিন-তিরিক্ষে নয়-ও আপনাদের এই মাথার ঘিলু-গলানো আসরে তিরুপল্লির তিন্তিড়ি হয়ে যেতে পারে..."

"শাবাশ, শাবাশ।" শিবুর নিয়ে আসা নরহরি না নরেশ্বরবাবুর তাল-মেলানো গজরানির মাঝে ঘনাদার অমন তারিফ শুনে আমরা

অবাক। শাবাশ বলে তারিফ জানিয়েই ঘনাদা থামলেন না, সোৎসাহে শিবুর আনা অতিথি নরহরি না নরেশ্বরবাবুকে নিজের সমর্থন জানিয়ে ঘনাদা বলে চলেছেন, "চালিয়ে যান, চালিয়ে যান।"

কিন্তু নরহরি বা নরেশ্বরবাবুর মেজাজটা তখন ওই দুটো 'শাবাশ' ছিটিয়ে শান্ত করবার নয়। তপ্ত তেলের কড়ায় জল পড়ায় তিনি যেন আরও চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন, "চালিয়ে যেতে বলছেন আমাকে ? বলতে লজ্জা করছে না ? সাতে নেই পাঁচে নেই, আমি মশাই নেহাত সাদাসিধে কলের জলের কন্‌ট্রাকটর। করপোরেশনের কলের জলের পাইপ লাগানো আর মেরামতের মিস্ত্রিও বলতে পারেন। সেই আমাকে আপনাদের কোথায় কলের জলের নতুন পাইপ লাগাতে হবে বলে ডাকিয়ে এ কী জুলুম আর শাস্তি !"

একটু থেমে থেকে শিবুর দিকে আঙুল তুলে করপোরেশনের জলের কলের কনট্রাকটর আবার বলতে শুরু করলেন, "উনি, ওই উনিই তো আমায় ডাকিয়ে এনেছেন। এখানে আসবার আগে অবশ্য আগে থাকতে একটু সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন, আমি যেন নিজে থেকে কথা বলে নিজের পরিচয়-টরিচয় না দিই। ওই ওঁর ইশারা না পাওয়া পর্যন্ত চুপ করে সব শুনেই যাই। কিন্তু সেই শুনে যাওয়া মানে কি এই যন্ত্রণা ? আমার নামটা নিয়ে পর্যন্ত কী হেলাফেলা ! পেঁচিয়ে দুমড়ে থেঁতলে নরহরি না নরেশ্বর বানানো ! শুনুন, আমার নাম নরহরি বা নরেশ্বর-টর নয়। সরল সোজা তিন অক্ষরের নবীন। বুঝেছেন ?"

নবীনবাবু তাঁর গায়ের জ্বালায় অনেক কথা যখন বলে যাচ্ছেন, ঘানাদার এই ক'দিনের লাগাতার ভাষণের ঝোঁকের রহস্যটা তখন ধরে ফেলেছি। কেরামতিটা অবশ্য শিবুর।

মাঝে-মাঝে যেমন হয়, বাহাত্তর নম্বরে তেমনি কিছুদিন আগে থেকে একটা গুমোটের পালা চলছিল। খুচখাচ তোয়াজ-তারিফ যা কিছু সম্ভব, ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা করেও ঘনাদাকে একটু হাঁ করাতেও যেন পারছিলাম না।

ঘনাদার বেয়াড়াপনা এবার ছিল একটু নতুন ধরনের। না অসহযোগ-টোগ নয়, তার বদলে যেন একেবারে ন্যাকা সেজে যাওয়া। আমাদের কথায় কান দেন না এমন নয়, কিন্তু ফল তার হয় বিপরীত। ধান

শুনতে কান তো শোনেন বটেই, সে কানও আবার শব্দ শোনবার সহায়, না জল থেকে নিশ্বাসের হাওয়া সংগ্রহের জন্যে মাছেদের 'কানকো'র অক্ষর-সংক্ষেপ কি না, তাই যেন ঠিক করতে পারেন না।

বেয়াড়াপনাটা আরম্ভ করেছিলেন অবশ্য শিবুরই দোষে। কথায়-কথায় কেমন করে দক্ষিণ আমেরিকায় যার জন্ম, পৃথিবীর সেই সবচেয়ে হাল্কা বাল্সা-কাঠের ভেলায় যাঁরা পেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে পলিনেশিয়ার এক নগণ্য দ্বীপে এসেছিলেন, তাঁদের কথা হচ্ছিল। শিবু তার মধ্য দিয়ে নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে একটু ফোড়ন কেটে বলে ফেলেছিল, "নামগুলো একটু সাবধানে উচ্চারণ করতে হয় কিন্তু ঘনাদা। এক-আধটা তো নয়, অমন পাঁচ-সাতটা ভাষার খিচুড়ি। বানান ঠিক রাখাই প্রায় অসম্ভব।"

"ও, তাই বুঝি ?" ঘনাদা যেভাবে হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হবার ভঙ্গিতে শিবুর দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, শিবুর তাতেই হুঁশ হওয়া উচিত ছিল।

তার বদলে আহাম্মকটা আরও মাতব্বরির চালে বলেছিল, "হ্যাঁ, এই দেখুন না, ওই বাল্সা-কাঠের পালতোলা একটা ভেলা, কোনওরকম লোহা পেতল কি তামার পেরেক ইস্ক্রুপ ছাড়া শুধু বুনো লতার দড়িতে বেঁধে যিনি পেরু থেকে প্রায় গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটাই পার হবার আজগুবি কল্পনায় ক'জন নিজেরই মতো আধপাগলা বন্ধু জোগাড় করে সমুদ্রে ভেসেছিলেন..."

নিজের উৎসাহে নাগাড়ে বকে যেতে-যেতে হঠাৎ ঘনাদার দিকে চোখ পড়ায় শিবু একটু থেমেছিল।

ঘনাদা তখন তার দিকে আদার ব্যাপারীর কাছে যেন সওদাগরি জাহাজের খবর বলা হচ্ছে, কিংবা বলা যায় প্রথমভাগের পড়ুয়ার কাছে যেন মুগ্ধবোধের শ্লোক পড়া হচ্ছে, এমনভাবে বোকা সেজে চেয়ে আছেন।

এ চেহারা দেখেও হুঁশ কি হয়েছে শিবুর ? মোটেই নয়। নিজের বাহাদুরিতে সে যেন আরও উৎসাহিত হয়ে ঘনাদাকে জ্ঞান দিয়ে বলেছে, "হ্যাঁ, ওই থর হেয়ারডালের কথাই বলছি। উচ্চারণটা হেয়ারডাল কি না তারই বা ঠিক কী ?"

"হ্যাঁ," শিবুর কথার মধ্যেই ঘনাদা হঠাৎ তাঁর অরামকেদারায় সোজা

হয়ে বসে তাঁর বিদ্যাসাগরী চটিতে পা গলাতে গলাতে বলেছেন, "ওসব ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।"

তারপর আমরা কেউ কিছু বলবার করবার আগেই ঘনাদাকে বারান্দার দরজা দিয়ে সোজা ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে দেখা গেছে।

"কিন্তু..." আমাদের মতোই হতভম্ব শিবুর মুখ দিয়ে শুধু ওই শব্দটি যখন বেরিয়েছে, ঘনাদার বিদ্যাসাগরী চটি তখন ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির প্রথম ধাপ ছাড়িয়ে গেছে। বিদ্যাসাগরী চটির তাল দেওয়া চটপটির সঙ্গে ঘনাদার শেষ যা কথা শোনা গেছে, তা হল, "ঠিক! ঠিকই বলেছ। হাতেখড়ি না হতেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয় নিরেট আহাম্মকেরাই করতে যায়।"

॥ ২ ॥

কী হয়েছে তারপর থেকে?

তাঁর টঙের ঘর থেকে ঘনাদা আর নামাই দিয়েছেন বন্ধ করে। এর আগে যেমন বহুবার হয়েছে, তেমনই বনোয়ারি আর রামভুজের বকলমেই আমাদের সামান্য যা-কিছু বিনিময় চলছে।

প্রতিদিন সকালের খবরের কাগজগুলো আগে থাকতে নিজের ঘরে আনিয়ে ঘনাদা তাঁর বাড়ি-ভাড়ার পাতাগুলোতে বেছে-বেছে তাঁর মনের মতো ভাড়াবাড়ির বিজ্ঞাপনে লাল কালিতে দাগ মারছেন। কোথায়-কোথায় তিনি উঠে যেতে পারেন তা আমাদের জানাবার জন্যে!

না, না। ওসব কিছু নয়। ওরকম কোনও বদমেজাজ কি বেয়াড়াপনার কোনও লক্ষণই তাঁর মধ্যে এবার নেই। বরং বলা যায়, তিনি যেন আরও মোলায়েম, আরও-আরও মাটির মানুষ হয়ে উঠেছেন এই কিছুদিন থেকে।

আড্ডাঘরে এসে জমায়েত হয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর বিদ্যাসাগরী চটির চটপটানির জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আর অপেক্ষা করতে হয় না কোনওদিন। আমাদের কেউ সে-ঘরে গিয়ে ঢোকবার আগেই দেখা যায় তিনি সেখানে প্রসন্ন মুখে তাঁর মৌরসি কেদারা দখল করে হাজির।

হ্যাঁ, শুধু হাজির নন, একেবারে রীতিমত হাসিমুখেই তিনি সেখানে উপস্থিত। আমাদের মধ্যে প্রথম যে গিয়ে উপস্থিত হয়, কুশল প্রশ্নটুকু

তাকে করতে তিনি ভোলেন না। যেমন, 'আজ একটু দেরি হল যে ? শরীর ভাল তো ?'

বাহাত্তর নম্বরের ইতিহাসে যা কখনও শোনা যায়নি, আচমকা একেবারে অপ্রত্যাশিত তেমন প্রশ্ন প্রথম শুনে বেশ একটু ভড়কে গিয়ে আমাদের মুখ দিয়ে কিছু অস্পষ্ট 'অ্যাঁ মানে হ্যাঁ' গোছের অব্যয়ধ্বনি যদি বেরিয়ে যায়, তাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ, ঘনাদা তাঁর আগের প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে বিষয়ান্তরে চলে যান। সেই দ্বিতীয় উক্তিটি শুনতে খারাপ না লাগবার হলেও বেশ চমকপ্রদ।

"বায়না দিয়ে এলাম," ঘনাদা হয়তো বেশ একটু চমকে দিয়ে বলেন, "ওই এক চেঙাড়ি মানে দশ গণ্ডারই বায়না দিয়ে এলাম, বুঝেছ ?"

বুঝতে আমাদের একটু দেরি হলে তিনি আরও বিশদ হয়ে বলেন, "হিঙের কচুরির বায়না হে ! ওই শিবু হালুইকরের হিঙের কচুরির। সবে দেখলাম কড়া চাপিয়ে লেচি বেলে ভাজা শুরু করেছে। তাই দিয়ে এলাম এক চেঙাড়ি মানে দশ গণ্ডারই বায়না। কী বলো, ঠিক করিনি ?"

ঠিক না তো কি বেঠিক কিছু করেছেন ! করলেও সে-কথা কে বলবে ? তাই সানন্দেই তাঁর কথায় সায় দিই।

কিন্তু তারপর ?

সেই তারপর নিয়েই হয়েছে যত গোল।

ঘনাদা রাগ করেন না, মেজাজ দেখান না। আমাদের বর্জন করবার কোনও লক্ষণও তাঁর কোনও কিছুতে নেই। শুধু তিনি যেন··· তিনি যেন··· না, সোজাসুজি বলেই ফেলি কথাটা, তিনি যেন সাধ করে আর-এক মানুষ সেজে আমাদের নাক-কানগুলো মলে দিচ্ছেন।

আর-এক মানুষ সাজা কীরকম ? কীরকম আর, কতকটা ভ্যাবাগঙ্গারামেরই কুটুম-ভাই বলা যায়।

যেন নেহাত ভালমানুষ। রাগ নেই, বিরক্তি নেই, নেহাত ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। কিন্তু ক-এর কোন্ দিকে আঁকড়ি আর র-এর শূন্যটা কোন্ দিকে পড়ে, তাও যেন জানেন না।

মুখে একবার 'ম' উচ্চারণ করলে যিনি মহাভারত না-আউড়ে থামতে পারেন না, সেই ঘনাদার কানের ফুটো যেন বন্ধ, আর জিভটা যেন অসাড়।

সাত চড়ে কেন, সাত-সাতে ঊনপঞ্চাশ সিধে আর বাঁকা জেরার খোঁচাতেও তাঁর মুখে রা নেই।

শুধু কি রা নেই! সাড়ই যেন নেই মগজে।

তাঁকে একটু জাগাবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি কি কিছু করেছি? বলতে গেলে বিশ্বকোষের স্বরে-অ থেকে শুরু করে অনুস্বর বিসর্গ পর্যন্ত হরফের কিছু না কিছু একবার করে নাড়া দিয়ে গেছি, কিন্তু ফল যা হয়েছে, তাতে আমাদের প্রায় দেওয়ালে মাথা খোঁড়া না হোক, দু'হাতে মাথার চুল ছেঁড়ার অবস্থা!

আড্ডাঘরের মজলিস শুরু হবার কিছু পরে ইচ্ছে করেই একটু দেরি করে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকে গৌর উত্তেজনায় যেন প্রায় তোতলা হয়ে বলেছে, "শুনেছেন ঘনাদা, শুনেছেন, কুমেরু অভিযান থেকে কী খবর পাঠিয়েছে আমাদের এবারের কুমেরু অভিযাত্রী-দল?"

"কী খবর?" আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রায় ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছি, "ভাল খবর, না মন্দ?"

"ভাল খবর কী আর হবে!" শিশির যেন এরই মধ্যে হতাশায় কাতর হয়ে বলেছে, "খারাপ খবর নিশ্চয়ই। যেখানে ছ'মাসের শীতের রাতের জন্যে ডেরা বাঁধা হয়েছিল, সেই গঙ্গোত্রীই বোধহয় ধসে তলিয়ে গেছে বরফের তলায়।"

"কী যা-তা বলছিস," আমি ওদের ধমক দিয়ে ঘনাদার শরণ নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, "সত্যি সেরকম কিছু হতে পারে ঘনাদা? অতসব ঝানু-ঝানু বৈজ্ঞানিকের দল বেছে-বেছে অমন কাঁচা জায়গায় ডেরা পাততে পারে?"

"পারে না-পারে সে পরের কথা," শিবু আমায় ধমক দিয়ে থামিয়ে বলেছে, "খবরটা কী, তা-ই আগে শোনো না। কী বলেন ঘনাদা, কাকে কান নিয়ে গেছে শুনে কানটা ঠিক আছে কি না, হাত বুলিয়ে না দেখেই কাকের পিছনে দৌড় দেওয়া কেন?"

"ঠিক, ঠিক," বলে শিবুর কথায় সায় দিয়ে এবার গৌরকে চেপে ধরা হয়েছে, খবরটা কী তা জানবার জন্যে।

কিন্তু গৌর তা বলতে পারেনি। তার কৈফিয়ত হল এই যে, বাসে

আসতে-আসতে ফুটপাতে বিকেলের বিশেষ খবর বলে এক ফেরিওয়ালাকে সে 'কুমেরুর জবর খবর ! এই বেরিয়ে গেল' বলে হাঁকতে শুনে এসেছে।

তা হাঁকতে শুনেও একটা বিশেষ খবরের পাতা কিনে নিয়ে আসেনি কেন ?

তা কিনতে নামলে আর সে-বাস কেন, কোনও বাসে কি ফিরতে পারত ? গৌর চটপট জবাব দিয়ে জানিয়েছে।

"খবরটা কী তাই যদি না জোগাড় করতে পেরে থাকো, তা হলে মিছিমিছি এখানে এসে আমাদের অমন অস্থির করে তোলবার দরকার কী ছিল !"

আমাদের এ-নালিশের উত্তর যেন গৌরের মুখস্থ ছিল। সে চটপট জবাব দিয়ে বলেছে, বাঃ, কাগজে ছাপা খবরটা না দেখেও ঘনাদা ব্যাপারটা শুনলে সেটা কি অনুমান করতে পারবেন না ? তাই জন্যেই তো সেই শুধু খবরটুকু শুনেই ঘনাদাকে সেটা জানাবার জন্যে ছুটে এসেছে।

"শাবাশ ! শাবাশ !" গৌরের অকাট্য যুক্তিতে আমাদের বাহবা দিতেই হয়েছে।

কিন্তু লাভ কি কিছু হয়েছে তাতে ? দিনকাল যখন আলাদা ছিল, তখন ওই একটা খেই ধরিয়ে দিলেই ঘনাদা তা থেকে কোন্ পঞ্চাশটা ফ্যাঁকড়া বার করে আমাদের একেবারে মাথায় চক্কর লাগানো উপাখ্যান না বুনে ফেলতেন !

আর কিছু না হোক, কুমেরুর ক'মাইল পুরু জমা বরফের নীচে থেকে ডাইনোসরদের হার-মানানো এক বিদ্‌ঘুটে আজগুবি জানোয়ারের ফসিল কি আর আচমকা ঠেলে বার করতেন না দারুণ এক ভূমিকম্পে ?

কিন্তু সে-সব কেরামতি দূরে থাক, ঘনাদার কাছ থেকে একটু নড়েচড়ে ওঠার লক্ষণও দেখতে পাওয়া যায় না।

তার জন্যে একটু খোঁচাতেও আমরা বাকি রাখি না।

"জবর খবরটবর সব বাজে কথা, কী বলেন ঘনাদা ?" শিশির ব্যাপারটাকে তাচ্ছিল্য করে ঘনাদাকে প্রতিবাদে উসকে দিতে চায়।

কিন্তু লাভ কিছু হয় কি ? একেবারেই না।

এ যেন ঠাণ্ডা কড়াইয়ে জলের ছিটে দেওয়া। ছ্যাঁক করে একটা শব্দও

শোনা যায় না।

"একটা বিকেলের জরুরি খবর কিনতে পাঠাব নাকি ঘনাদা ?" আমি হাওয়াটা গরম রাখবার চেষ্টায় জিজ্ঞেস করলাম।

কিন্তু কাকে কী জিজ্ঞেস করছি ? আমরা যাঁকে জাগাতে চাইছি, তিনি এখন কোমাতেই আচ্ছন্ন বললে অবস্থাটা কিছুটা বোঝানো যায়।

নেহাত জবাব না দিলে ছাড় নেই বুঝে যেন ক্লান্ত, নির্বিকারভাবে বললেন, "তা আনাও ! তবে..."

সত্যিই আনাতে হলে যে বিপদ হত, ওই 'তবে'টুকুর জোরে সেটা এড়িয়ে, তাড়াতাড়ি বলতে হল এবার, "হ্যাঁ, আনতে পাঠানোতে লাভ নেই। কী না কী বিশেষ খবর, এতক্ষণ কি আর তা বিক্রি হয়ে যেতে কিছু বাকি আছে ? তবে খবরটা ওই দক্ষিণ গঙ্গোত্রীরই নিশ্চয়, কী বলেন আপনি ?"

'গঙ্গোত্রী' শব্দটাই যেন প্রথম শুনলেন, এমনভাবে নির্বোধের মতো আমাদের দিকে চেয়ে ঘনাদা শুধু শব্দটা আর একবার উচ্চারণ করে বললেন, "গঙ্গোত্রী বলছ ? তা সে গঙ্গোত্রী..."

সলতে একটু ধরেছে আশা করে উৎসাহভরে বললাম, "হ্যাঁ, কুমেরুর যে জায়গাটায় আমাদের অভিযাত্রীরা ছ'মাস দিনের পর ছ'মাস রাতও কাটাবে বলে পাকা আস্তানা তৈরি করেছে, সেটারই ওরা গঙ্গোত্রী মানে 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' নাম দিয়েছে না !"

কী বললেন এবার ঘনাদা। নিভু-নিভু সলতেটা একটুও এবার ধরল কি ?

না, আমাদের সব চকমকি ঠোকা বৃথা। ঘনাদা যা বললেন, তাতে ভিজে সলতে একটু শুকোবার লক্ষণও নেই।

"ও," বললেন ঘনাদা, "ওই নাম দিয়েছে বুঝি ওরা ? দক্ষিণ, কী বলে... দক্ষিণ গঙ্গোত্রী।"

কী ইচ্ছে করে এর পরে ? ঘনাদার এই বেয়াড়া রোগের সূত্রপাত যার জন্যে হয়েছে তাকেই এই বাহাত্তর নম্বর থেকে নির্বাসন দিতে ইচ্ছে করে না কি ?

কিন্তু তার দরকার হয় না।

রোগ যার বাধে, দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাটাও সেই করে।

দাওয়াইটা বেশ অদ্ভুত। প্রথমে দাওয়াই বলে ধরাই যায়নি।

বাহাত্তর নম্বরের এখনকার নিতান্ত জোলো মজলিসে ক'দিন আগে হঠাৎ একটা নতুন মুখ দেখা গেছে। কার এ মুখ, কোথা থেকে আমদানি, এ-সব কিছু জানবার আগে শিবুর কাছে সামান্য দু'একটা ইশারা আমরা অবশ্য পেয়েছি।

"'শব্দ-কল্পতরু'র নাম শুনেছ তো ?" শিবু যেন জনান্তিকে জানিয়েছে আমাদের, "এ তা হলে আর-এক নিখিল বিশ্ব শব্দ-কল্পতরু। এমন কিছু ভূ-ভারতে নেই, যা ওই মানুষটাকে একটু নাড়া দিয়ে বার করতে পারা যায় না। আর একবার মুখ খুললে সে অনর্গল কথার ফোয়ারা বন্ধ করে কে ? শুধু একটু বুঝেসুঝে ফোয়ারাটা চালু করতে হয়। মেজাজি মানুষ তো, এমনিতে মুখ যেন খুলতেই চায় না।"

যাঁর সম্বন্ধে কথাগুলো বলা হয়েছে, তাঁকে মাত্র একদিনই বাহাত্তর নম্বরে আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে; শিবুর সঙ্গে সন্ধের দিকে এসে সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে আড্ডাঘরে খানিক বসে শিবুর সঙ্গে তিনি আবার ঘর ছেড়ে চলে গেছেন।

ওপরে যাঁর কথা লেখা হল, প্রথম দিনের নীরব সাক্ষাতের পর দ্বিতীয় দিনে শিবু যখন প্রথম তাঁর বিশদ পরিচয় দিয়েছে, তিনি নিজে তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। ওপরের টঙের আড্ডাঘরে তাঁকে তখনও দেখা না গেলেও ন্যাড়া ছাদের সিঁড়িতে তাঁর বিদ্যাসাগরী চটির চটপটানি সিঁড়ি থেকে বারান্দায় পৌঁছবার শব্দ তখন পাওয়া গেছে।

শিবু অবশ্য তার নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস যেরকম তারস্বরে প্রচার করেছে, তাতে সিঁড়িতে পা দেবার আগে নিজের টঙের ঘর থেকেই ঘনাদার তা শুনতে খুব অদসুবিধে হত না।

বাইরে বারান্দা থেকে ঘনাদা যখন ঘরে ঢুকেছেন, শিবু তখন তার নতুন আবিষ্কারের নামটা আমাদের জানিয়ে বলেছে, "ওঁর নামটা ভাল করে জানার সুযোগ অবশ্য হয়নি। হবে কোথা থেকে ? এমনিতে থাকেন একেবারে স্ফিংসের মতো বোবা হয়ে, আর কথা যখন একবার শুরু করেন, তখন তার মধ্যে তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করবার ফুরসত থাকে কখন! তবে নামটা ওই নবীন না নরেশ্বর না নরহরি গোছের কিছু বলে যেন মনে হচ্ছে।"

শিবুর কথা শেষ হবার আগে ঘনাদা ঘরের যথাস্থানে এসে তাঁর মৌরসি কেদারাটি দখল করতে করতে বলেছেন, "ভাল, ভাল, নামটা ঠিক নাই জানো, আবিষ্কারটা করেছে তো ঠিক। যা-তা নয়, একেবারে নিখিল শব্দ-কল্প-দ্রুম। অর্থাৎ কিনা ইউনিভার্সাল এনসাইক্লোপিডিয়া। মানে বিশ্বকোষ। শুকনো পুঁথির কাগজের নয়, জীবন্ত বিশ্বকোষ, মানে দ্বিতীয় ব্যাসদেব আর কি!"

ঘনাদা তখন তাঁর যা বলবার বলেই যাচ্ছেন, আর আমরা ঠিক সজ্ঞানে আছি কি না জানবার জন্যে নিজেদের চিমটি কাটব কি না ভাবছি।

চিমটি সত্যি অবশ্য কাটিনি। কিন্তু আমাদের মাঝখানের মৌরসি কেদারায় আসীন মানুষটি যে আমাদের এ-কদিনের ঘনাদা, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে।

কী তাঁর হয়েছিল, তা একেবারে অজানা না হলেও, হঠাৎ এ-রূপান্তর কী করে যে তাঁর হল, তার রহস্যটা যে ধরতেই পারছি না।

এ কি আমাদের টঙের ঘরের সেই তিনি, এই গত কালই যাঁকে 'রাম' বলাতে হন্যে হয়ে গিয়ে 'মরা' পর্যন্ত বলাতে পারিনি। হঠাৎ তাঁর বোবা গলায় কথার যেন বান ডেকেছে। সে-বান আবার বাঁধভাঙা হয়ে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে শিবুর আবিষ্কার বিশ্ব-শব্দকল্পদ্রুম নরহরি না নরেশ্বরবাবুর ঘরে এসে ঢোকায়।

"আসুন, আসুন, নরহরি না নরেশ্বর না দ্বিতীয় ব্যাসদেবঠাকুর, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। বসুন, বসুন। হ্যাঁ, হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসুন। আপনি নাকি কথা আরম্ভ করলে তার অবিরাম তোড়ে আর কারও কোনও কথা পাত্তা পায় না, তাই আমার কথাটা আগেই বলে রাখছি সেই শব্দ-কল্পদ্রুম নিয়ে। আমাদের এই বাংলা ভাষায় প্রথম শব্দ-কল্পদ্রুম কবে কে প্রকাশ করেছিলেন, তা আপনাকে নতুন করে কী শোনাব? স্যার রাধাকান্ত দেববাহাদুরের সেই আশ্চর্য কীর্তিটি তখনকার হিতবাদী মেশিনাক্ষ্যো' যন্ত্রে মুদ্রিত হয়েছিল বলেও মনে করতে পারছি। শুধু কোন্ সালে ছাপা হয়েছিল আর মুদ্রাকর কে ছিলেন, তাই নিয়ে মনে যা একটু সংশয় আছে। তা আপনি নিশ্চয় নিরসন করে দেবেন! আপনার অপেক্ষায় সেই আশাতেই আছি..."

ঘনাদা যেন ভক্তিভরে শিবুর আনা নতুন অতিথির দিকে চেয়ে প্রায়

হাত জোড় করে মিনতি করবার ভঙ্গি করেছেন এবার।

কিন্তু শিবুর আনা নরহরি বা নরেশ্বরবাবু কেমন অসহায় অস্থিরভাবে, "আজ্ঞে...আমায়...বলছেন, মানে...আমি..."বলতে গিয়ে প্রায় তোতলা হবার উপক্রম হতে, "থাক, থাক, আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত তখন যা জানবার সবই ঠিক সময়ে জানব," বলে তাঁকে তখনকার মতো রেহাই দিয়ে ঘনাদা তাঁর লাগাতার একক ভাষণ কোথায় যে নিয়ে গেছেন, তা আগেই জানানো হয়েছে।

এর আগে ক'দিন যাঁর গলা দিয়ে একটা হাঁচিকাসির আওয়াজও আর বার হবে না বলে সন্দেহ হচ্ছিল, সেই ঘনাদা হঠাৎ মুখে কেন যে বুকনির বান ডাকাচ্ছেন, তা বুঝতে আমাদের তখন আর বাকি নেই। আহাম্মক শিবুকে একটু ভাল করে শিক্ষা দেবার জন্যেই তার আমদানি করা পণ্ডিতকে একেবারে ছাল ছাড়িয়ে নেবার কী অবস্থায় যে এনে দাঁড় করিয়েছেন, তা আমরা দেখেছি।

কিন্তু ফ্যাসাদ বেধেছে নকল বেদব্যাস সাজানো নরহরি কি নরেশ্বর নয়, জলের কলের কনট্রাক্টর, নেহাত সাদাসিধে নবীনবাবুকে নিয়ে।

সম্পূর্ণ বিনা দোষে অকারণে তাঁকে টিটকিরির শিকার করে তোলার অবিচারে নরহরি নরেশ্বর নয়, নেহাত সাদাসিধে নবীনবাবু যখন বিগড়ে গিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছেন, তখন ঘনাদা সত্যিই পড়েছেন বিপদে।

"আপনি মানে..." ঘনাদা বিব্রত অপ্রস্তুত হয়ে বলেছেন, "ওসব পণ্ডিতটণ্ডিত, ওই কী বলে, শব্দ-কল্পদ্রুম গোছের কিছু নন তা হলে? মাফ করবেন, নরহরি, না না, নরেশ্বর, থুড়ি নবীনবাবু, আমি আমার ভুলের জন্যে বারান্দা থেকে ন্যাড়া ছাদ পর্যন্ত সব কটা সিঁড়ি নাকখত দিয়ে উঠতে রাজি আছি। আপনি শুধু আমায় ক্ষমা করবেন।"

ঘনাদার কথাগুলো শুনব কী, তাঁর কান্ড দেখে তখন আমাদের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধোবার অবস্থা।

ঘনাদা তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। শুধু উঠে দাঁড়াননি, বারান্দার দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলেছেন, "মিছিমিছি কটা বাজে বুকনি ছেড়ে বাহাদুরি নেবার চেষ্টায় আপনার সময় নষ্ট করেছি বলে আমি সত্যিই আপনার কাছে মাফ চাইছি। আচ্ছা, নমস্কার!"

"নমস্কার," বলে ঘনাদা সত্যি তখন রওনা দিয়েছেন বারান্দার দরজা·

দিয়ে ন্যাড়া ছাদের সিঁড়ির দিকে।

হায়, হায়! একেবারে ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি! শিবুকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ঘনাদা তো হাজার একের ওপর আরও ক'টা আরব্যরজনী নামিয়ে এনেছিলেন।

সেসব তো গেল গাঢ় অমাবস্যায় হারিয়ে।

এখন ঘনাদাকে আর কি ফেরানো সম্ভব? ছিড়ে যাওয়া তার আবার জুড়ে আর কি সুরে বাঁধা যায় ভাঙা সারেঙ্গি?

যায় যায়। ব্যাপারটা একরকম হোমিওপ্যাথিই বলা যায় নিশ্চয়। রোগ যা ধরায়, দাওয়াই জোগায় তা-ই।

ঘনাদার বিদায়-নমস্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধমকই যেন শোনা গেল। শুধু ধমক অবশ্য বলব না, ধমকেরই সুরে যেন একটা নালিশ, "নমস্কারের মানে? নমস্কার মানে চলে যেতে চান আমাদের 'কী জানো, কী হল, কী হবে'র ভয়, ভাবনা, সন্দেহের কাঁটাতারের বেড়ার ওপর ঝুলিয়ে? না, না, সেটি হবে না। গণপতি না গজেশ্বরবাবু, এলোপাতাড়ি সন্দেহ সংশয়ের কাঁটা যা সব ছড়িয়েছেন, তা সাফ না করে আপনার যাওয়া চলবে না।"

"আরে, আরে, করেন কী নরহরি, না, থুড়ি নবীনবাবু?"

নবীনবাবুর এর আগের প্রাণখোলা বক্তৃতায় আর ব্যবহারে যতই খুশি হয়ে থাকি, এবার তাঁকে সামলাবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে ধরতে হল।

ধরতে হল তখন তিনি ঘনাদাকে প্রায় জাপটে ধরে আবার বসাবার চেষ্টা করছেন বলে।

"কী, করছেন কী নবীনবাবু!" সঠিক নামটা ধরেই তাঁকে শাসন করতে হল এবার, "টানাটানি করছেন কেন ওঁর হাত ধরে?"

"বেশ, হাত ছেড়ে দিয়ে পা'ই না-হয় ধরছি," নবীনবাবু তা-ই করতে গিয়ে ঘনাদা সরে যাওয়ার জন্যেই বিফল হয়ে বললেন, "আমাদের মনের খোঁচাগুলো উনি শুধু বাড়িয়ে দিয়ে যান। শুধু জিজ্ঞাসাগুলো জানিয়ে উত্তরগুলো চেপে চলে যাওয়াটা কি ওঁর উচিত হচ্ছে?"

"আচ্ছা বলুন, কোন্ উত্তরটা চান?" ঘনাদাই এবার ফিরে দাঁড়িয়ে জানতে চাইলেন।

"একটাই তো নয়, অনেক জিজ্ঞাসারই উত্তর চাই," নবীনবাবুই

আমাদের সকলের মনের কথাটা জানিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার কী বলে, একটু বসলে ভাল হত না ?"

আমাদের সকলকে অবাক করে, লজ্জা দিয়ে নবীনবাবু এবার ঘনাদার মৌরসি কেদারাটাই টেনে তাঁর কাছে এনে পেতে দিলেন।

ঘনাদা কি বিরক্ত ? ভেতর থেকে রাগটা কি ফোঁস করে ওঠার উপক্রম করছে ?

মুখ দেখে তা অবশ্য বোঝা গেল না। শুধু গলাটা একটু গম্ভীর রেখে ঘনাদা জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, কোন্ উত্তরটা চান প্রথম ?"

"প্রথম ?" নবীনবাবু কী বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন নিজের কর্তব্যটা স্মরণ করে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, "বলুন না আপনারাই, প্রথমে কোন্ জবাবটা শুনতে চান ?"

"না, না, আপনি বলুন," এ-মজলিসের মেজাজ যিনি শুধরেছেন, তাঁকেই অধিকারটা আমরা সানন্দে দিলাম।

"তা হলে," অনুমতি পেয়ে নবীনবাবু খুশিমুখে বললেন, "ওই যে বিলেতের ওয়েলস্-এর কোন খুদে স্টেশনের আটান্ন হরফের এক ঘটোৎকচ-মার্কা নামের বানান শোনালেন, সে-বানান যে ঠিক, তার প্রমাণ কোথায় মিলবে ?"

"তার প্রমাণ ?" ঘনাদার মুখের ছায়াটা একটু হালকা হচ্ছে কি ? "তার প্রমাণ মিলবে বিলেতের স্টাউট নামে পানীয়ের জন্যে বিখ্যাত কোম্পানির 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস' নামে বইতে। সেই বই দেখে এক-এক করে আটান্নটা অক্ষর মিলিয়ে দেখতে পারো। আচ্ছা, এ-প্রশ্ন তো হল, তারপর ?"

"তারপর ? তারপর ?" শিশিরই এবার জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, মহিষাসুরের মতো বিরাট আর চামচিকের মতো চিমসে যে দু'জন আপনাকে অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত মধ্যোপসাগরের এক প্রায় অজানা জেলেদের দ্বীপে গিয়ে দেখা পায়, তারা কে, কেনই বা আপনাকেই অত করে খুঁজছিল ?"

"কেন খুঁজছিল তা তো আগেই শুনেছ।" ঘনাদার স্বর কি একটু ক্লান্ত ?

॥ ৩ ॥

পাছে তিনি ধৈর্য হারান সেই ভয়ে তাঁর মেজাজকে তোয়াজ করার সুরেই বললাম, "আপনি যা বলেছেন তা যে বুঝতে পারিনি, তা ঠিক। জোচ্চোর বাটপাড় ধাপ্পাবাজ হলে তাদের ব্যবস্থা করবার জন্যে তো কোর্ট-কাছারি, পুলিশ আর গোয়েন্দাটোয়েন্দা আছে।"

"তা আছে!" ঘনাদা একটু যেন হাসলেন, "কিন্তু পুলিশ-গোয়েন্দারা যখন কূল পায় না, তখনই তো হয় মুশকিল। ওদের হয়েছিল তাই।"

"ব্যাপারটা কী হয়েছিল যদি দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেন," নবীনবাবুর সঙ্গে আমরাও মিনতি জানালাম, "এ তো সাধারণ চুরি-ডাকাতি, তহবিল তছরুপ গোছের কিছু মনে হচ্ছে না, কিন্তু..."

"হ্যাঁ, ওই কিন্তুটাই বড় ভয়ানক," ঘনাদার গলায় একটু উৎসাহের আভাসই পাওয়া গেল এবার, সাধারণ চুরি-ডাকাতি নয়, কিন্তু আমেরিকা, জার্মানি, ফ্রান্সের মতো বড়-বড় দেশের শেয়ার মার্কেটে মানে ব্যবসার বাজারে যেন ভূমিকম্প লেগেছে। একটা ধুরন্ধর ধাপ্পাবাজ সেখানে শেয়ার বেচাকেনার এমন কারসাজি করেছে যে, তার ফাঁপানো সুদিনের খোয়াব দেখানো ফাঁপানো ফানুস হঠাৎ ফেঁসে গিয়ে একদল লোভী ফাটকাবাজারির একেবারে সর্বনাশ হয়েছে। সেই ফেঁসে-যাওয়া ফাটকাবাজারিরাই এখন ওই দুশমনকে খুঁজছে হন্যে হয়ে। কিন্তু খুঁজলে কী হবে? ক'দিনের জন্যে দুনিয়ার বাজারে দেখা দিয়ে প্যাঁচালো বুদ্ধির জোরে ছড়ানো ধাপ্পায় লোভীদেরই বেশি করে ফাঁদে ফেলে যে একেবারে খতম করে দিয়ে গেছে, তার পাত্তা আর কে কোথায় পাচ্ছে?"

"তা হলে?" দ্বিধাভরেই জিজ্ঞেস করলাম আমরা, "সেই ধুরন্ধর ধড়িবাজকে ধরার দায় শেষ পর্যন্ত আর নিলেন না?"

"নেবার ইচ্ছেই তো ছিল না, কিন্তু..." ঘনাদা যেন স্বীকার না করে পারলেন না, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেরই যে লোভ হল দুনিয়ার ধড়িবাজ চূড়ামণিকে স্বচক্ষে একবার দেখে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। তাই কিংকং-এর ছোট ভাইয়ের হাতের মোচড়ে যেন ককিয়ে উঠেই তার

হুকুমটা মেনে নিলাম শুধু একট শর্তে।"

"'শর্ত ! তোর আবার শর্ত কী রে উচ্চিংড়ে,' দুশমন দানোটা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, 'কাজটা হাসিল করলে তোরই পছন্দমতো হয় ডান নয় বাঁ কানটা ছিঁড়ব। এই একটা শর্ত তুই অবশ্য করতে পারিস বটে !'

"'না, অমন অবুঝ হবেন না,' যেন মিনতি করে বলেছিলাম, 'আপনাদের কাজ হাসিল করবার জন্যেই এ-শর্তটা আমার রাখা দরকার।'

"' বেশি বকবক করিসনি,' ধৈর্য হারিয়ে কিংকং-এর ভাই ছোট কং এবার ধমক দিয়ে বলেছে, 'কী তোর শর্ত বলে ফ্যাল্, শুনি।'

"'এমন কিছু নয়,' আমি যেন ভয়ে-ভয়ে বলেছি, 'শর্ত শুধু এই যে, আমি আপনাদের মক্কেলকে এক বছরের মধ্যে খুঁজে বার করব ঠিক, কিন্তু আমাকে তারপর আপনাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

"'তার মানে ?' ছোট কং মানে ঘটোৎকচের দাদা রাগে রক্তচক্ষু হয়ে আমার দিকে চেয়ে এবার গর্জে উঠেছে, 'তুই খুঁজে বার করবি আমাদের ধুরন্ধরকে ? আর তারপর তোকে খুঁজতে হবে আমাদের ? এ কী উলটো-পালটা রসিকতা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ? দেব এবার মুণ্ডুটা সত্যি উলটো দিকে ঘুরিয়ে।'

"ছোট কং তখনই আমায় ধরবার জন্যে হাত বাড়ায় আর কি !

"তার নাগালের বাইরে একটু সরে গিয়ে বললাম, 'মিছিমিছি রাগ করছেন কেন ? আপনাদের যা আসল উদ্দেশ্য তার সিদ্ধির জন্যেই এ-শর্তটা যে দরকার, তা বুঝতে পারছেন না কেন ? আপনাদের মক্কেল তো বলছেন ধড়িবাজ-চূড়ামণি। তাকে খুঁজে বার করে সামনাসামনি কোতল করতে গেলে আপনাদের হবে কিছু ? যা আপনাদের বিশেষ দরকার, তার সেই গোলমেলে কাজ-কারবার আর লেনদেনের গোপন কাগজপত্র তখন কি আর হাত করতে পারবেন ? সে আগেই সব দেবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নষ্ট করে। তাই বলছি, আমি এক বছরেরই মধ্যে তাকে খুঁজে বার করবার কড়ার করছি। কিন্তু খুঁজে বার করে আমি শুধু তার ওপর নজর রাখার বেশি আর কিছু করব না। করলে সব কাজ যাবে ভেস্তে ! আপনাদেরই তাই তখন আমায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করে আপনাদের সেই ধড়িবাজের সঠিক সন্ধান পেতে হবে।'

"ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই বেশ একটু জটিল গোলমেলে করে তাদের

কাছে সাজিয়ে ধরেছিলাম। ঠিকমতো কিছু না বুঝলেও নিজেদের গরজে শেষ পর্যন্ত আমার শর্ত মানতে তারা আর আপত্তি করেনি।"

গল্প যেন এখানেই শেষ, ঘনাদা এমনভাবে থেমে যাওয়ায় নবীনবাবুই প্রথম প্রতিবাদ করলেন, "ও কী, থামলেন যে ? সেই শুঁটকো চামচিকে আর কিংকং-এর ভাই ছোট কং আপনার শর্ত না-হয় মেনে নিল, তাতে হল কী ? ধরতে পারলেন সেই ধড়িবাজ-চূড়ামণিকে ? কোথায় কেমন করে ধরলেন ?"

"ধীরে, বন্ধু ধীরে," আমাদেরই এবার নবীনবাবুকে সামলাতে হল, "কোথা দিয়ে কেমন করে কী হল, শুনুনই না একটু ধৈর্য ধরে।"

"ধৈর্য ধরে শুনব ?" আমাদের বকুনিতে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে নবীনবাবু বললেন, "কিন্তু শেষ ফলটা না-জানলে স্বস্তি পাচ্ছি না যে !"

"ও, আপনি তা হলে তাদেরই একজন, গোয়েন্দা-গল্প পড়তে শুরু করে প্রথমেই শেষ পাতাগুলো উলটে যারা অপরাধীটা কে, জেনে নিতে চায়। না মশাই, ওই ধৈর্যটুকু না থাকলে বাহাত্তর নম্বরের মজলিসে বসে আপনি সুখ পাবেন না।"

"কেন ?" নবীনবাবু এবার একটু যেন গরম, "এখানে গল্প তৈরি হতে-হতে বুঝি বদলেও যায় ? **আসামী** যায় পালটে ?"

"না, তা যাবে না !" নবীনবাবুর কথার প্রতিবাদে আমরা কেউ কিছু বলার আগে ঘনাদারই বাজখাঁই গলা শোনা গেল, "বরং শেষ দিক থেকেই শুরু করে উজানে পিছিয়ে যাচ্ছি।"

"উজানে পিছিয়ে যাচ্ছি মানে ?" গৌর আমাদের সকলের হয়ে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারল না, "ঠিক ধারা ধরার বদলে উলটো দিক থেকে শুনলে গল্পের সেই আসল মজা আর থাকবে ?"

"থাকবে, থাকবে !" আমরা সমস্বরে আশ্বাস দিলাম, "এ একরকম 'বাহবা', বুঝেছ ? যেদিক দিয়ে শুরু করো, একই দাঁড়ায়।"

আমাদের যুক্তিটা জোরালো না হলেও সমর্থনটায় ঘনাদা অখুশি হলেন না বলেই মনে হল। প্রসন্ন মুখেই বললেন, "তারপর ঠিক একবছর কোনও সাড়াশব্দ আর করিনি। ঠিক বার-তারিখ ধরে একটি বছর শেষ হবার পর ছোট কং আর তার চিমসে সঙ্গী একটা চিঠি পেয়েই নিশ্চয়ই একেবারে হতভম্ব। আমাদের মতো আঠারো মাসে বছরের দেশ নয়, খাস মার্কিন

মুলুকের রাজধানী ওয়াশিংটন শহরের লাগাও 'মেরিল্যান্ড'-এ একটা পাঁচতারা হোটেল। ডাকে চিঠি দিলে সেখানে মারা যাবার কি বিলি হতে দেরি হবার কোনও ভয় না-থাকলেও নিজের হাতে হোটেলের চিঠির বাক্সে আমার দুই মুরুব্বির নামের চিঠিটা ফেলেছি।

"ভোরবেলা 'জরুরি' ছাপ দেওয়া চিঠিটা ফেলেছি, সুতরাং ব্রেকফাস্টের সময়েই সে-চিঠি তাদের হাতে পৌঁছেছে নিশ্চয়ই। খাম খুলে সে-চিঠি পড়তে-পড়তে আর সঙ্গীকে শোনাতে-শোনাতে দুজনের মুখের অবস্থা কী হয়েছে দেখতে না পেলেও অনুমান বোধহয় ঠিকই করতে পেরেছি।

"চিঠিটার ভাষা ছিল :

মনিব বাহাদুর, ছোট কং ও চিমসে চামচিকে মহোদয়,

দেখতে-দেখতে এক বছর তো হয়ে গেল। আমার কাজ তো আমি ঠিকমতো শেষ করছি, কিন্তু এখনও আপনাদের দেখা নেই কেন? কথা ছিল আমি এক বছরে আমার কাজ সারব, আর আপনারাও তখন আমায় খুঁজে নেবেন। আপনাদের শ্রীমুখ এখনও পর্যন্ত একবারও না দেখে মনে হচ্ছে, এখনও আমার সঠিক পাত্তা আপনারা পাননি। তা হোক, হতাশ না হয়ে চেষ্টা করে যান। অধ্যবসায়ে সব কিছু সম্ভব।

ইতি বশংবদ ঘনশ্যাম

"এ-চিঠির পরে আবার একটু 'পুনঃ' দিয়ে লেখা :

আপনাদের ধুরন্ধর ধড়িবাজ মক্কেলকে তাড়াতাড়ি খুঁজে বার করবার একটা হদিস এখানে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, আপনারা যাকে খুঁজছেন, সেই মক্কেল এক পাকা জাত-জুয়াড়ি। মাছের আঁশটে গন্ধ যার ধ্যানজ্ঞান, সেই বেড়ালকে যেমন মাছ কোটার হেঁশেলে, তেমনি রক্তে যার জুয়ার নেশা তেমন পাকা জাত-জুয়াড়িকে কোথায় পাওয়া যায়, একটু ভেবে দেখুন না। হ্যাঁ, স্যার, একটা কথা, আপনাদের ধড়িবাজ-চূড়ামণি পাকা জাত-জুয়াড়ি, ইতিমধ্যে এই মেরিল্যান্ডের এক হাসপাতালে একরাশ ডলার এই কিছুদিন হল দান করেছে। এ-খবরটা যাচাই করে নেবেন। ধড়িবাজ-চূড়ামণিকে কিন্তু খুঁজে যান।

"তা খুঁজতে তারা কি আর কিছু বাকি রেখেছে?

"কিন্তু এরপর তাদের অবস্থা যা হল তা আরও করুণ ছাড়া আর কী বলা যায় !

"মেরিল্যান্ডের হোটেলে যে চিঠি পেয়েছিল তাতে গায়ের জ্বালায় ছটফট করে তারা আটলান্টিকের এপার-ওপার হয়ে তখন মন্টিকার্লোয় এসে একটা ভিলা-বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে।

"মন্টিকার্লো নামটা উচ্চারণ করবার পর আর বোধহয় কোনও বিবরণ দিতে হয় না। হ্যাঁ, ফ্রান্সের দক্ষিণে মধ্যোপসাগরের উপকূলে দুনিয়ার সেই জুয়াড়িদের অমরাবতী মন্টিকার্লো। ভাগ্যের রুলেট চাকা সেখানে এক-এক চক্করে দু'দশ লাখ নয়, অমন কোটি-কোটি টাকার বরাত ঘুরিয়ে আনে কি উড়িয়ে দেয়।

"ছোট কং আর তার চিমসে দাদা সেখানে ক'দিন হল এসে সমুদ্রের তীরে রিভিয়েরায় একটা স্বর্গপুরীর মতো ভিলা ভাড়া করে আছে।

"আছে মানে ভিলায় নয়, ঠিকানাটা তাই রেখে সারা দিন-রাত তারা সব জুয়ার ঘাঁটি ক্যাসিনো থেকে ক্যাসিনো ঘুরে তাদের মক্কেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এর আগে মেরিল্যান্ডে পাওয়া চিঠিটায় উচ্চিংড়ে সেই দাশটা লিখেছিল সারা দুনিয়ার ফাটকা বাজারে যে ধড়িবাজ সব বাঘা-বাঘা কারবারি আর দালালদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল, সে যে আসলে একজন জুয়াড়ি, সে-কথা মনে রাখতে। সে-কথা মনে রাখলে সেই ধড়িবাজকে দাতব্য লটারির মজলিসে খোঁজার কোনও মানে হয় না নিশ্চয়।

"কথাটা মনে ধরেছিল বলেই কং আর তার শুঁটকো সঙ্গী এদিক-ওদিক একটু ঘুরেফিরে এই মন্টিকার্লোয় এসে উঠেছে। জুয়াড়ির এমন স্বর্গ আর কোথায় আছে দুনিয়ায় !

"কিন্তু কই ! এখানে আসা অবধি সারা দিনরাত সব ক'টা ক্যাসিনোতে পালা করে সারাক্ষণ ধরনা দিয়েও সেই ধড়িবাজের টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পেল না।

"সে-ধড়িবাজের দেখা পাওয়ার বদলে পেল সেই গায়ে জ্বালা-ধরানো চিঠিটা।

"চিঠিটা সেই শুঁটকো উচ্চিংড়ে দাশটার।

"দাশ লিখেছে : *'আরে ছ্যা, ছ্যা। তোমরা যে এমন নিরেট আহাম্মক তা ভাবতেই পারিনি। সমস্ত দুনিয়ার কারবারের চাকা স্রেফ বুদ্ধির প্যাঁচে যে উলটে-পালটে*

যেমন খুশি ঘুরিয়ে দিয়ে সিসের গাদ থেকে সোনার তাল বানিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে খুঁজতে এসেছ জুয়োর চাকতিতে, ভাগ্য ফেরাবার ছেলেখেলা যেখানে হয় সেইসব ক্যাসিনোয় রুলেটের টেবিলে গাওস্কর তার হাতের মার ঠিক রাখতে গেছে ডাংগুলি খেলতে ? না হে, উজবুকরা, তা নয় । যাকে তোমরা খুঁজছ রুলেটের জুয়ায় হাত নোংরা করবার মানুষ সে নয় । মন্টিকার্লো, কি তোমরা এর আগে যেখানে খোঁজ করে এসেছ, সেই লাসভেগাসের দশ-বিশ লাখ ডলার লাভে তার লোভই নেই । সাগর হেন পাঁচ-দশটা দীঘি যে বাগিয়েছে, দুটো পাতকোর জন্যে হ্যাংলামি সে করবে কেন ? তার আবার দানের কথা শুনেছি, আর ক'টা নতুন দানের কথা শোনো । ইউরোপে যেমন তেমনি আফ্রিকাতেও দু-দুটো নতুন বিরাট হাসপাতাল বসাবার সমস্ত খরচ সে দেবার ব্যবস্থা করেছে । যা গচ্চা দিয়ে তোমরা হন্যে হয়ে তাকে ধরবার জন্যে ছোটাছুটি করছ, তোমাদের সেই লোকসানের টাকা দিয়েই সে এসব দানধ্যান যে করছে, তা বুঝতে পেরে তোমরা যে দাঁত-কিড়মিড় করছ, তা টের পাচ্ছি । কিন্তু উপায় তো নেই । তোমাদের নাক-কান যে এমন করে মলে দিয়েছে, তার হদিস পেতে হলে বড়ের চালে যেখানে কিস্তিমাতের খেলার কেরামতি দেখা যায়, সেখানে যেতে হবে । তোমাদের ওই ফাটকাবাজারি বুদ্ধি নিয়ে শুধু নিজেদের চেষ্টায় সেখানে পৌঁছবার আশা অবশ্য কম । তবু চেষ্টা করে যাও, করে যাও চেষ্টা ।'

"চিঠিটা পড়তে-পড়তে ছোট কং আর তার শুঁটকো সঙ্গীর চেহারা যা হয়েছিল, তা যে এঁকে রাখবার মতো তা নিশ্চয় বলতে হবে না । একজন যেন মাটিতে পোঁতা মাইন, আর অন্যজন, যাকে ক্ষেপণাস্ত্র বলে, সেই মিসাইল ।

"চিঠিটা যখন তারা পেয়েছে তখন নিজেদের শিকার খুঁজতে একটা ক্যাসিনোর মধ্যে বসে নজর রাখছিল বলেই কোনওরকমে নিজেদের সামলে তারা আগুনের হল্কার মতো রুলেট-টেবিল ছেড়ে ক্যাসিনোর বাইরে বেরিয়ে এসেছে ।

"এইমাত্র চিঠিটা একজন বেয়ারার হাতে তাদের কাছে পৌঁছেছে । বেয়ারাকে খুঁজে পেতে দেরি হয়নি । কিন্তু খুব ফ্যাশনদুরস্ত পোশাক পরা অজানা এক ভদ্রলোক দূর থেকে তাদের দু'জনকে দেখিয়ে দিয়ে জরুরি চিঠিটা তাদের দেবার নির্দেশ দিয়ে চলে গেছে । এর বেশি সে-বেয়ারা আর-কিছু হদিস দিতে পারেনি ।

"রীতিমত ফ্যাশনদুরস্ত দামি পোশাকের ভদ্রলোক যে চিঠিটা যথাস্থানে দেবার জন্যে মোটা বকশিশও দিয়ে গেছে, বেয়ারা শেষপর্যন্ত তা স্বীকার না করে পারেনি।

"কিন্তু চিঠি দিয়ে লোকটা গেল কোথায় ? ক্যাসিনোর মধ্যে সে ঢোকেনি, ক্যাসিনোর বাইরেও তার কোনও চিহ্ন দেখা যায়নি। সেখানকার ক্যাসিনোর বাহারে-উর্দিপরা নেহাত শোভা হিসেবে বসিয়ে রাখা এক দ্বারপাল তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঘুমোচ্ছে বলা যায়। আর এ-সব ক্যাসিনোতে যেমন থাকে, তেমনি দু-একজন হাড়হাভাতে ফতুর-হওয়া জুয়াড়ি ভাগ্যের কৃপায় মোটা দাঁওটাও যারা মেরেছে এমন কারও কারও কাছে নানা ছুতোয় কিছু ভিক্ষে পাবার আশায় ঘোরাঘুরি করছে।

"ছোট কং আর তার সঙ্গী ক্যাসিনোর বাইরে বেরিয়ে আসতেই তেমনি একজনের পাল্লায় পড়ে।

"মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটা চোখ কালো ঠুলিতে ঢাকা। পকেট আর বোতাম-ঘর ছেঁড়া একটা ওভারকোট কাঁধে ঝোলানো লোকটা ছোট কং আর তার সঙ্গীর জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল। তারা বাইরে আসতেই তাদের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাকুলভাবে বলে, 'শুধু একটা ফ্রাঁ মঁসিয়ে, শুধু একটা ফ্রাঁ ঢাকা দিয়ে বরাতের চাকা একেবারে ঘুরিয়ে দেব দেখুন।'

"ছোট কং আর তার সঙ্গী রাগে বিরক্তিতে তাকে ঠেলে দিয়ে যত সামনের দিকে এগোবার চেষ্টা করে, সে নাছোড়বান্দা হয়ে ততই তাদের প্রায় জড়িয়ে ধরে থামাবার চেষ্টা করে বলে, 'দোহাই আপনাদের, লাখে একজনের ভাগ্যে একবারই যা কখনও আসে, এমন করে সেই আশীর্বাদ পায়ে ঠেলবেন না। শুনুন, শুনুন, আজ এই বিকেল ঠিক চারটের পর থেকে তিনের পড়তার দিন। হ্যাঁ, লাল চৌকো আর তিনের নামতার পড়তা চলবে। সারা রাত জেগে দিনক্ষণের জ্যোতিষী হিসেব কষে আমি দেখেছি। একটা ফ্রাঁ দিয়ে শুরু করতে পারলে আমি ক্যাসিনোর গোটা জুয়ার ব্যাঙ্ক ফেল করিয়ে দিয়ে যেতে পারতাম। শুধু একটা ফ্রাঁ পেলে··· যা আমার নেই···'

"মন্টিকার্লোর মতো বড়-বড় জুয়াড়িদের সাধের শহরে এরকম পাগল

নানা আস্তানায় প্রায়ই দেখা যায়। জুয়ার নেশায় সর্বস্ব খুইয়ে তারা আবার জ্যোতিষ গণনায় নির্ভুল লাভের ছক কষে বার করবার স্বপ্ন দ্যাখে। আইনের শাসন আর পুলিশের চোখ এড়িয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায় এমনি করে।

"ছোট কং আর তার সঙ্গী নাছোড়বান্দা ভিখিরিটাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলেই শেষ পর্যন্ত ক্যাসিনোর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল, কে তাদের চিঠিটা পাঠিয়েছে তা জানবার আশায়।

"কিন্তু শান্ত নির্জন দুনিয়ার কুবের হেন ধনীদের জুয়ার নেশা মেটাবার অমরাবতীর মতো শহরের বাইরে তখন দক্ষিণের উপসাগর থেকে মধুর সমুদ্রের হাওয়া বইছে। দূরে-দূরে ক্যাসিনোগুলোর বাহারি আলোর মালা এক-এক করে জ্বলে উঠতে শুরু করেছে।

"রাগে দাঁত ঘষতে-ঘষতে দুই দুশমন আবার ক্যাসিনোর দিকেই ফিরতে গিয়ে দ্যাখে, সেই গায়ে ছেঁড়াখোড়া ওভারকোট ঝোলানো নাছোড়বান্দা ভিখিরিটা একটু যেন খোঁড়াতে-খোঁড়াতে তাদের দিকেই আসছে।

"ছোট কং তখন রাগে প্রায় বুঝি ফেটেই পড়ে। 'খবরদার বলছি গিরগিটিটা,' একটু থেমে বুনো বরার মতো ঘোঁতঘোঁতিয়ে সে বললে, 'আর এক পা যদি এদিকে আসিস তাহলে তোর পল্‌কা শিরদাঁড়াটাই মটকে দেব। সত্যি ভেঙে দেব।'

"লোকটা ভয় পেয়েই নিশ্চয় অতদূর এসেছিল। তারপর আর না এগিয়ে যেন হতাশ হয়ে বললে, 'আমায় একটা ফাঁ দিয়ে বরাত ফেরাবার মওকা তো দিলে না। তা না দাও, তবু তোমাদেরই বরাত ফিরুক। এই কাগজটায় আজকের জ্যোতিষের গণনায় পড়তার নম্বর কী, তা লিখে কষে দেওয়া আছে। তোমরাই একটু গা ঘামিয়ে ভাগ্যের চাকাটা ঘোরাতে পারো কি না দ্যাখো।'

"লোকটা দূর থেকে একটা কাগজের পাকানো ডেলা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। ছোট কং রাগে সেটা পা দিয়ে মাড়িয়ে ছিড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সিড়িঙ্গে সঙ্গী তার আগেই কাগজের ডেলাটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখল।

"'ওটা তুমি কুড়িয়ে নিলে ডুগানচাচা ? তোমার ঘেন্না হল না ?' ছোট কং প্রায় দাঁত খিচিয়ে বললে।

"'না, ঘেন্না হবে কেন ?' হেসে জবাব দিলে ছোট কং-এর সিড়িঙ্গে সঙ্গী ডুগান, 'কাগজের ডেলাটা তো আর পকেটে কামড়াচ্ছে না ?'"

॥ ৪ ॥

ঘনাদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প :

"পকেটে না কামড়াক, সেই নাছোড়বান্দা ভিখিরির ছুঁড়ে দেওয়া কাগজের ডেলাটা অমন লজ্জা আর অপমানের জলবিছুটির জ্বালা যে সারা শরীরে ধরাবে, তা কি ওরা জানত! আসল নামগুলো যখন জানাই হয়ে গেছে, তখন তা-ই ব্যবহার করে বলি, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা-মার্কা কার্ভালো তা ভাবতেই পারেনি।

"ক্যাসিনোর বাইরে থেকে বৃথাই ঘুরে এসে নিজেদের রুলেটের মজলিসে গিয়ে বসবার আগে পকেটে রাখা কাগজটা খুলে বার করে পড়তে গিয়ে দু'জনের চোখ প্রায় ছানাবড়া।

"এ কার চিঠি ! কী নিয়ে চিঠি ?

"না, এ-চিঠি জুয়ায় ফতুর হওয়া কোনও হেরো ভিখিরির নয়, যাকে কুচিকুচি করে কেটে গায়ের জ্বালা যায় না, সেই উচ্চিংড়ে দাশের।

"দাশ লিখেছে : *'চিনতে পারলে না তো ? ওভার কোটটা শুধু উলটে পরে, মাথায় একটা লাল ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, একটা চোখ একটা ঠুলিতে ঢেকেছিলাম। তাতেই অমন বোকা বনার পর দুনিয়ার ফাটকাবাজার ফাটানো সেই ধড়িবাজ-চূড়ামণিকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে, এ-আশা আর করতে পারি ? অন্য সব কথা বলার আগে আমার ওভারকোটটার কথাই বলে দিই। ওটি সরল সোজা ছদ্মবেশ। ওর এক দিকটা ছেঁড়াখোঁড়া ময়লা একটা ওভারকোটের যেন শেষ অবস্থা। ওভারকোটটা ওলটালেই অন্য দিক কিন্তু একেবারে হাল ফ্যাশনের ঝকঝকে-তকতকে, নতুন সাজ। উলটো দিকটা বাইরে রেখে পরে ক্যাসিনোর বেয়ারাকে তোমাদের হাতে পৌঁছে দেবার চিঠিটা দিয়েছিলাম। তারপর বাইরে আসবার আগে একটা বাথরুমে ঢুকে মাথায় মিথ্যে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর চোখে ঠুলি লাগিয়ে ওভারকোটটা উলটে পরে এসেছিলাম। যাই হোক, তোমাদের বুদ্ধির পরীক্ষা করে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। যাকে খুঁজছ, সত্যিই যদি তার হদিস পেতে চাও, কাল দিনের প্রথম ফ্লাইটে এখান থেকে বিলেতের 'হিথরো'তে গিয়ে নামবে। তারপর কী করতে হবে, সেখানকার এয়ারপোর্ট থেকে উড়োজাহাজ কোম্পানির বাস-এ তাদের শহরের আস্তানা মানে সিটি অফিসে গিয়ে*

পৌঁছবার আগেই তার হদিস পাবে নিশ্চয়।'

"হদিস তারা যা পেয়েছিল, তাতে তাদের নিরেট মাথা দুটো ঠুকে দেওয়াই উচিত ছিল। তবু তা না করে ধৈর্য ধরে তাদের বলেছিলাম, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা দুনিয়ার এক ধড়িবাজ-চূড়ামণিকে ধরার আশা রাখো ? হিথরোতে নেমে তোমরা শেষ পর্যন্ত এই ঘোড়দৌড়ের মাঠে এলে তার খোঁজে ? আগে দুনিয়ার সেরা সব জুয়ার আড্ডায় তাকে খুঁজেছ, তারপর এই বিলেতে এসে নেমে এলে কিনা ঘোড়দৌড়ের মাঠে!'

"'মানে···,' ছোট কং অর্থাৎ আসলে গোরিলা কার্ভালোর শুঁটকো সঙ্গী ডুগান একটু বুঝি লজ্জিত হয়েই বলেছিল, 'আমরা ভাবলাম যে, আজ বিলেতে দুনিয়ার সেরা ঘোড়দৌড় ডার্বির খেলা হচ্ছে, তাই সে ধড়িবাজটা···'

"'থামো,' ধমক দিয়েই বলেছিলাম, 'তোমরা যাদের সঙ্গে কারবার করো, এ সেই হেঁজিপেঁজি ধড়িবাজ নয়, এত দিনেও তা বোঝোনি ! টাকা রোজগারটা এদের মতো মানুষের কাছে কোনও সমস্যাই নয়। কারবারে দুনিয়ায় এদিকে ওদিকে ক'টা প্যাঁচ কষে এরা যখন যত খুশি মুনাফা লুটতে পারে বললেই হয়। যাকে তোমরা খুঁজছ, সেই ধুরন্ধরের আবার টাকায় লোভ নেই বললেই হয়। তার আগের দুটো দাতব্যের কথা তোমরা আগেই শুনেছ, এখন জেনে রাখো, মন্টিকার্লো থেকে ছেড়ে আসবার আগে সেখানেই সে একটা বড় ক্যানসার হাসপাতালের জন্যে মোটা সাহায্যের টাকা দিয়ে এসেছে। না, টাকার কুমির হওয়া নয়, এ মানুষের নেশা হচ্ছে মানুষের জীবন আর জগতের যেসব ব্যাপার আজও পরম বা ধাঁধা হয়ে আছে, বুদ্ধি দিয়ে তাদের রহস্য ভেদ করা। মহাভারতের যুগে জন্মালে এ মানুষ অর্জুনের সঙ্গে দ্রুপদরাজের লক্ষ্যভেদের বাহাদুরির খেলায় পাল্লা দিত। গাণ্ডিবীকে লজ্জা-দেওয়া সেই মানুষকে তোমরা খুঁজতে এসেছ এই এপসম ডাউন্স-এ ?'

"ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ঘোড়দৌড় ডার্বি খেলার মাঠ এপসম ডাউন্সের মধ্যে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। হিথরোতে প্লেন থেকে নেমে তারা আর কোথাও নয়, এই বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠেই প্রায় ছুটে আসবে, তা বুঝে এখানে এসেই দুই মূর্তিমানকে ধরেছিলাম। তাদের বুদ্ধির দৌড়ে আর একবার ধিক্কার দিয়ে সেই কথাই আর একবার বললাম, 'মন্টিকার্লো থেকে

বিলেতের হিথরোতে এসে নেমে লন্ডন শহর পর্যন্ত আসার পথে এই ডার্বির ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া আর কোনও কিছুর কথা তোমাদের মনে পড়ল না ? ওই নিরেট দুটো মাথার ঘিলুতে আর কোনও ভাবনা একটু নাড়া দিল না ?'

"'না, দিল না !' এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক বাক্য সয়ে ছোট কং, বা তার আসল যা নাম তাই ধরে বলি, গোরিলা কার্ভালো খেপে গেছে বললেই হয়। ডার্বি-দৌড়ের দিন এপসম ডাউন্সের সেই মাঠ-ভর্তি দিনমজুর থেকে লাট-বেলাট, বড়লোকের ভিড়ের মধ্যে আমার একটা হাত ধরে মোচড় দিয়ে প্রায় ছিড়ে নেবার চেষ্টা করে বললে, 'আমরাই যদি ভাবব, তা হলে তোকে হুকুম দিয়ে কাজে লাগিয়েছি কেন ? নে, খুঁজে বার কর তোর সেই মক্কেলকে। নইলে তোর দুটো হাত আর মাথাটা এখানেই ছিড়ে ফেলে দিয়ে যাব। কী, বুঝলি, যা বললাম ? এক্ষুনি বার কর তোর মক্কেলকে।'

"'এক্ষুনি বার করতে হবে ?' যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, 'কিন্তু তা হলে এ-জায়গা ছেড়ে একটু যেতে হবে যে !'

"'যেতে হবে ?' ছোট্ট কং মানে গোরিলা কার্ভালো আগুনের হলকা বার-করা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় ?'

"'বেশি দূরে নয়,' যেন ভয়ে-ভয়ে বললাম, 'এই ওয়াটারলু স্টেশনে।'

"'ওয়াটারলু স্টেশনে !' শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো দু'জনেরই গরম গলায় এবার খিচুনি শোনা গেল, 'রসিকতা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে ?'

"তারপর ছোট কংই আলাপের মওড়া নিয়ে বললে, 'জিভটা টেনে ছিড়ে নেব, এইটা মনে রেখে যা বলবার বলবি। কোথাও এতদিনে যার খোঁজ মেলেনি, ওই ওয়াটারলু স্টেশনে গেলেই তার দেখা মিলবে ? সে আমাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে বসে আছে ?'

"'তা কি আর আছে !' সবিনয়ে স্বীকার করলাম। 'তবে তাকে খুঁজে বার করতে হলে ওই ওয়াটারলু স্টেশনে যাওয়া ছাড়া তো আর কোনও উপায় দেখছি না।'

"'তা ছাড়া উপায় দেখছিস না !' ছোট কং মানে গোরিলা কার্ভালো তার মুঠো করা ডান হাতটার রদ্দাটা আমার বাঁ কানের ওপর চালাবে কি

না, তক্ষুনি ঠিক করতে না পেরে কী ভেবে নিজেকে তখনকার মতো সামলে বললে, 'বেশ, তোর ওয়াটারলু স্টেশনেই চল্‌। সেখানে আজ তোর এস্‌পার কি ওস্‌পার, এইটে শুধু মনে রাখিস।"

"মনে আর কী রাখব? দুই বুনো মক্কেলকে বেশ একটু ভুলিয়ে-ভালিয়েই সেদিন ওয়াটারলু থেকে উত্তর স্কটল্যান্ডের একটা গাড়িতে তুলতে হল।

"এর আগে ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে ওয়াটরলু আসবার পথেই ট্যাক্সিতে দুই মক্কেলকে কিছুটা নরম করতে পেরেছিলাম। নরম আর কিছুতে নয়, স্রেফ মোটা দাঁও-এর লোভ দেখিয়ে। 'তোমরা ফাটকাবাজারের লোকসান পুষিয়ে নেবার জন্যে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছ, আর সে মানুষটা অত লোভের পড়তা হেলায় অগ্রাহ্য করে দানধ্যান করেই সব বিলোতে বিলোতে অন্য কী এক ধান্দায় উধাও হয়ে গেছে! তার মানে কী? সে-ধান্দায় এমন দারুণ কিছু লাভ নিশ্চয়ই আছে, যা আমাদের কল্পনাতেই নেই। সুতরাং সে-মানুষটাকে খুঁজে বার করে তার এখনকার ধান্দাটা জানাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

"শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো মুখ গোমড়া করে রাখলেও আমার কথাগুলো একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেনি। দুনিয়ার কারবারি লেনদেনের বাজার নিয়ে যে এমন অনায়াসে ছিনিমিনি খেলে যখন খুশি লাভের পুঁজির পাহাড় জমিয়ে ফেলতে পারে, সে কোন্‌ লোভে এ সুখের স্বপ্ন ছেড়ে কোন্‌ অজানা ধান্দায় হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়?

"সে ধান্দাটা কী, তা জানবার আগ্রহটা আমার দুই বুনো মক্কেলের মধ্যে জাগিয়ে তুললেও স্টেশন থেকে তাদের বিলেতের হিসেবে দূরপাল্লার গাড়িটায় তুলতে একটু বেগই পেতে হয়েছে।

"এপসম ডাউন্‌স থেকে ওয়াটারলু স্টেশনের নাম করে বার হলেও রাস্তায় একটু যেন লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করেছিলাম যে, বিলেতের রেল-স্টেশনের খবর আমার তেমন জানা নেই। তাই ঠিক ওয়াটারলু স্টেশনে গেলেই কাজ হাসিল হবে কি না বলতে পারছি না। তবে ওয়াটারলু না হোক, বড় গোছের একটা স্টেশনে গেলে চলবে।

"'যে-কোনও বড়গোছের স্টেশন হলেই চলবে?' শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো বেশ একটু সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করেছিল।

'"হ্যাঁ, যে কোনও, মানে ...একটু বড়গোছের স্টেশন হলে নিশ্চয়,'
এমনিভাবে এলোমেলো খানিক বুকনি দিয়ে দুই মক্কেলকে তখনকার মতো ঠাণ্ডা করলেও সত্যিকার কাজটা হাসিল করবার জন্যে যে প্যাঁচটা কষলাম, সেটা কাজে না লাগলে সমস্ত ব্যাপারটাই যেত মাটি হয়ে।

"তা যে হয়নি তার কারণ গোরিলা কার্ভালো আর শুঁটকো ডুগানের মতো মক্কেলদের মেজাজ-মরজির মারপ্যাঁচ কষে নিতে আমার ভুল হয়নি।

"একটার জায়গায় দুটো বড় স্টেশনে এফোঁড়-ওফোঁড় যেন খোঁজাখুঁজি করে আমি তখন আমার দুই মক্কেলকে একেবারে খাপ্পা করে তুলেছি।

'"কই, কোথায় তোর শিকার ?' স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ওপরই যেন আমার ধড়মুণ্ডু ছিঁড়ে আলাদা করে দেবে এমনি হিংস্র চাপা গলায় গোরিলা কার্ভালো তার হিংস্র চোখ দুটো দিয়ে আমায় যেন খুবলেছে।

'"এই যে ! এই যে ! এক্ষুনি ধরে দিচ্ছি,' আমি যেন ভয়ে-ভয়ে বলেছি, 'একটু শুধু ধৈর্য ধরো।'

"আর বেশি ধৈর্য ধরবার অবশ্য দরকার হয়নি। এক থেকে আর-এক স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ব্যস্তভাবে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক যা চাইছিলাম তা আমি পেয়ে গেছি।

"যে প্ল্যাটফর্মে তখন এসে দাঁড়িয়েছি, বরাত-জোরেই নিশ্চয় দূরপাল্লার ট্রেনটা তখন সবে তা থেকে ছাড়তে যাচ্ছে। একেবারে খালি একটা ডিল্যুক্স কামরা থেমেছে ঠিক আমাদেরই সামনে।

"আমার মাথায় মতলবটা খেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটা লম্বা হুইসিল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর যা করবার তাতে এতটুকু ভুল আমার হয়নি। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে কামরার ভেতরে উঠে পড়ে আমি দরজা থেকে পাশের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেছি, 'টা-টা বন্ধুরা, টা-টা ! আশা করি আবার ...'

"কথাটা শেষ করতে কিন্তু পারিনি উদ্বেগে উত্তেজনায়। কী করবে এবার দুই মূর্তিমান। রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও উজবুকের মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে ছুটন্ত ট্রেনে আমায় সরে পড়তে দেবে ?

"তা যদি দেয় ...না, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মতো মূর্তিমানদের মরজি-মেজাজের মারপ্যাঁচ কষতে আমার ভুল হয়নি।

"চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে দরজা থেকে একটা জানলার কাছে এসে আমার মুখ বাড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই রাগে একেবারে আগুন হয়ে পড়ি কি মরি করে দুজনেই ছুটে এসে পর পর দরজার হাতলটা ধরে ফেলে ভেতরে এসে ঢুকে পড়ল।

"দুজনেই এরপর ঝাঁপিয়ে এল আমার দিকে। গোরিলা কার্ভালোর চেয়ে শুঁটকো ডুগানের রাগটা একটু বেশি। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বার করে সে তার ফলাটা যে-রকম উৎসাহের সঙ্গে খুলতে যাচ্ছিল, তাতে তার কনুইয়ে সামান্য একটু টোকা দিয়ে হাতটা অবশ করে ছুরিটা মেঝেতে ছিটকে ফেলতে হল। গোরিলা কার্ভালো তখন প্রায় আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একটু কাত হয়ে সরে গিয়ে তাকে একধারের আসনের ওপর গড়িয়ে পড়তে দিয়ে মাথার মাঝখানে দু' আঙুলের একটা টোকা দিয়ে বললাম, 'একেবারে কংক্রিট মনে হচ্ছে রে!' গোরিলা কার্ভালো চাঁদির ঠিক মাঝখানে সেই টোকা খেয়ে চোখের তারা উলটে একটা বার্থের ওপর বসে পড়বার পর কামরার মেঝে থেকে ডুগানের ছুরিটা তুলে নিয়ে ফলা মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে বললাম, 'লড়াইটড়াই যা হবার খুব হয়েছে। এবার যেজন্যে এই প্যাঁচ করে তোমাদের এ-গাড়িতে তুলেছি, সেই বৃত্তান্তটা শোনো। যে বাদশাহি আরামের ডিলাক্স কামরায় আমরা বসে আছি, এ-কামরা কাল ভোরের আগে আর কেউ খুলবে না। এই কামরাকে যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেই ট্রেনটাও তখন এদেশের উত্তরের এক শহরে গিয়ে থামবে। তোমরা যা খুঁজছ, আর আমি যা যতটা উদ্ধার করেছি, সেইসব রহস্যের ইতিহাস ভূগোল যা জানবার, সেখানেই জানা যাবে। তোমাদের হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে বিমানবন্দর থেকে খাস শহরে আসার পথেই তোমাদের মতো এপসন ডাউন্স-এর হাতছানির বদলে আমি এই আসল রহস্যের হদিস পাই। সেই হদিস পেয়ে এই লাইনেরই এইরকম এক ট্রেনে আমি যেখানে গেছি, যা যা দেখেছি, জেনেছি ও শেষ পর্যন্ত যে-রহস্যের সন্ধান পেয়েছি, তাই তোমাদের এখন শোনাব। যে ট্রেনে আমরা উঠেছি, একটানা সারারাত গিয়ে কাল ভোরে যেখানে তা থামবে, সেইটিই আমাদের গন্তব্যস্থান। শুধু তোমরা যা খুঁজছ, তার জন্যে নয়, আজকের দুনিয়ার এক অতল রহস্যের সন্ধান করতে হলে ওখানেই যেতে হবে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, বিলেতের হিথরো বিমানবন্দরে নামবার পর শহরে আসতে আসতে এই রহস্যের হাতছানি তোমাদের প্রথম থেকেই অস্থির করে তোলেনি। বিদেশের যে-কোনও জায়গা থেকে বিলেতে প্রথম পা দেবার পর ওই একটি রহস্যের প্রচণ্ড আকর্ষণে বেসামাল না হয়ে তো উপায় নেই। যেদিকে যাও, যেখানে যাও, ওই এক রহস্য হাজার ছুতোয় তোমাকে হাতছানি দেবেই। এমন হাতছানি, যার টান ছিড়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব বললেই হয়। হ্যাঁ, 'নেসি'র রহস্যের কথা বলছি। স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে লক্‌নেস নামে সেই আশ্চর্য হ্রদের কথা, যার রহস্যকে কেন্দ্র করে একটা গোটা মহাভারতের মতো নবপুরাণ, আর হোটেল-রেস্তরাঁ থেকে শুরু করে বই কাগজ খেলনা ছবি খাদ্য-পানীয়ের ফলাও একরাশ ব্যবসা ফেঁপে উঠেছে।'

"সব রহস্যের যা মূল সেই নেসি এখনও পুরোপুরি একটা অজানা ধাঁধা হয়ে আছে বললেই হয়। কিন্তু বিলেতে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের একটা সাধারণ শহরকে তা বিশ্বের ভূগোলে পাকা জায়গা করে দিয়েছে। সেই শহরের নাম ইনভারনেস, আর সেই শহরের কাছে মাইল-চল্লিশ লম্বা যে পাহাড়ি হ্রদটির হাজার দশেক বছর আগে প্রথম উদ্ভব হয় বলে ভূতাত্ত্বিকদের ধারণা, সেই পাহাড়ি হ্রদের একটি অতল রহস্য এখনও তার ব্যাখ্যা খুঁজছে।

"এ-ট্রেনের এই শৌখিন কামরায় সারারাত যেতে-যেতে উত্তর স্কটল্যাণ্ডের সেই ইনভারনেস শহর থেকে শুরু করে আমার সমস্ত বিবরণটা আমি দিয়ে যাব। কার্ভালো আর ডুগানকে বললাম, 'শুনতে শুনতে যদি ঘুম আসে তো ঘুমিয়ে পড়তে পারো। আমার তাতে আপত্তি নেই। শুধু বেয়াড়াপনা করার কিছু চেষ্টা করলে তোমাদের মধ্যে বয়সে বড় বলে শুঁটকো ডুগানকে কনুইয়ের দু'হাড়ে একটু করে টুসকি দিয়ে সারা অঙ্গ অসাড় করা রামঝিঝি ধরিয়ে দেব, আর, কার্ভালো, আমি তোমার নাম দিয়েছি ছোট কং। তোমার মাথার চাঁদিতে রামগাঁট্টা দিয়ে চোখ দুটো জমিয়ে ছানাবড়া করে রেখে দেব সেই সকাল অবধি। সকালেই আমরা ইনভারনেস গিয়ে পৌঁছচ্ছি। আশা করি তার আগে আমার গল্প বলার মধ্যে গল্পটা থামাবার মতো বেয়াদবি করার কুবুদ্ধি তোমাদের দু'জনের কারও হবে না।'

“যে শহরে আমরা নামতে যাচ্ছি, সেই ইনভারনেস দিয়েই আমার যা বলবার শুরু করি। মার্কামারা স্কটিশ শহর ইনভারনেস। সেইরকম সওয়ারি ঘোড়া আর ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালাবার সুবিধের জন্যে পাথরের নুড়ি বসিয়ে বাঁধানো সামান্য চওড়া সব রাস্তা, আর বেশির ভাগ সেকেলে একতলা দোতলা বাড়ি। পুরনো শহর।

“বিলেত বলতে আমরা এখন যা বুঝি, একসঙ্গে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ওয়েলস্ মেলানো সেই গ্রেটব্রিটেন তো চিরকাল ছিল না। এই সেদিনও তাদের এ-রাজ্য ও-রাজ্য বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড-স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে ঝগড়া-মারামারি-লড়াইয়ের শেষ ছিল না। সেইরকম লড়াইয়ে বলতে গেলে এই সেদিন, মানে এই ১৭৪৬ সালে এই ইনভারনেস শহরেই স্কচরা ইংরেজদের সবচেয়ে বড় পরাজয়ের লজ্জা দেয়।

“ইনভারনেসের নামডাক কিন্তু তারও অনেক আগে থেকে ছড়ানো শুরু হয়েছে। নামটা ছড়িয়েছে নুড়ি ফেলে বাঁধানো সরু সরু রাস্তা আর ছোট ছোট দোতলা একতলা বাড়ির জন্যে নয়। ওই শহরের গা থেকে ছড়ানো প্রায় চৌষট্টি কিলোমিটার লম্বা পাহাড়ি হ্রদটার জন্যে।

“স্কটল্যাণ্ড তো পাহাড়ি দেশ। ওরকম হ্রদ সেখানে তো ওই একটা নয়, তবে ওই পাহাড়ি হ্রদটা নিয়ে অত আদিখ্যেতা কেন ?

“লক্‌নেস নাম দেওয়া ওই হ্রদটা নিয়ে যে অত হইচই, তার কারণ ওই হ্রদটার একটা দারুণ রহস্য। দু’-দশ বছরের কথা তো নয়, বহু-বহু কাল আগে থেকে সঠিক তারিখ ধরে বলতে গেলে সেই ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে যাযাবর ধর্মযাজক সেণ্ট কলম্বা ওই ইনভারনেসের হ্রদে এক ভয়ঙ্কর জলচর দানবের সঙ্গে কথা বলে গেছেন। তিনি যখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হ্রদের জলে স্নান করবার সময় ভয়ঙ্কর এক জলদানবের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত একটি লোকের মৃত্যুর কথা শোনেন। সেণ্ট কলম্বা নিজে সেই হ্রদে স্নান করতে নামলে সেই ভয়ঙ্কর দানব তাঁকেও আক্রমণ করতে আসে। তবে সেণ্ট কলম্বা তাঁর ইষ্টদেবতার নাম জপ করে ক’বার ‘দূর হ, দূর হ’, বলাতেই দানবটা দূরের গভীর জলে পালিয়ে যায়।

“সেই ৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম প্রচারের পর থেকে ইনভারনেসের হ্রদের সেই ভয়ঙ্কর দানব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী ক্রমশই লোকের মুখে মুখে ফিরে একত্র জমা হয়ে উঠেছে। সে-সব বিবরণ পল্লবিতও হয়েছে

নানাভাবে। যেমন, সেই জলচর দানবের মুখ-চোখ দিয়ে নাকি আগুনের হলকা বার হয়। আর সামনে কেউ পড়লে তাকে চোখের সম্মোহনী দৃষ্টিতে সেই দানব নাকি নিঃসাড় নিস্পন্দ করে রাখতে পারে। এইরকম আরও অনেক গুজব।

"অবশেষে ১৯৩৪-এ এই জলচর দানবের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেল বলে মনে হল। পাওয়া গেল লণ্ডন শহরের এক শল্যচিকিৎসকের নেওয়া একটি ফোটোতে। ফোটোটায় পাওয়া গেল, হ্রদের ভেতর থেকে লম্বা গলা বাড়িয়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে একটি অদ্ভুত প্রাণীর ছবি।

"সে ছবি কেউ বিশ্বাস করল, কেউ-বা করল না। কিন্তু ইনভারনেসের হ্রদের অদ্ভুত প্রাণী সম্বন্ধে কৌতূহলের মাত্রা আর নানা বিবরণের সংখ্যা বাড়তেই লাগল ক্রমশ।

"এ পর্যন্ত কমপক্ষে তিন হাজার বার ইনভারনেসের হ্রদ কিংবা সংক্ষেপে লক্‌নেসে ওই প্রাণীটিকে দেখবার দাবি নানা জনে নানা সময়ে পেশ করেছে। তার মধ্যে কোন্‌টা সাচ্চা, কোন্‌টা ঝুটো বিচার করা কি সোজা কথা?

"যেমন এই ক'বছর আগে একদিন ভোরবেলায় অবিরাম ফোনের আওয়াজে অস্থির হয়ে জেগে উঠে লণ্ডনের প্রকৃতি-বিজ্ঞানের মিউজিয়ামের কিউরেটরমশাই তাঁর পরিচিত মাইকেল ওয়েদারেলের উত্তেজিত কণ্ঠে শুনলেন যে, মাইকেল খানিক আগেই লক্‌নেসের তীরে একটি সামুদ্রিক প্রাণীর পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ দেখেছেন।

"দুর্দান্ত খবর!

"দু'ঘণ্টার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় প্রাণিতত্ত্ববিদ হেলিকপ্টারে করে লক্‌নেসের তীরে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়ে তদন্ত শুরু করে দিলেন।

"কিন্তু হায়, সবই ধাপ্পা। পরীক্ষা করে বোঝা গেল, পায়ের ছাপ অন্য কিছু নয়, সব কটিই হিপোপটেমাসের। খানিক বাদে ইনভারনেসের স্থানীয় মিউজিয়াম থেকে চুরি করা হিপোপটেমাসের যে একটি ভুষি-ভরা কাটা পা হ্রদের তীরে ছাপ ফেলবার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটিকেও পাওয়া গেল।

"এরকম ঠাট্টার ব্যাপার দু-একটা মাঝে-মাঝে ঘটলেও লক্‌নেসের

জলচর দানব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিন্তু বন্ধ হয়নি। যে যাই বলুক, সমস্ত ব্যাপারটা যে হেসে উড়িয়ে দেবার নয়, গভীর ভাবে তা বিশ্বাস করে এই অজানা প্রাণীটির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা সমানে করে আসছেন, ব্রিটেন শুধু নয়, অন্য নানা দেশের বৈজ্ঞানিকেরাও।

"গত ২০ বছর ধরে রাডার যন্ত্র থেকে শুরু করে প্রতিধ্বনি পরিমাপকের মতো নানা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে তাই সন্ধানীর দল অবিরাম লক্‌নেসে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। ন'জন জাপানির একটি দল প্রায় দু'মাস ধরে অজস্র টাকা খরচ করে ওই হ্রদের নানা জায়গায় তাদের সন্ধান চালিয়ে এইটুকু নিশ্চিতভাবে জেনেছে যে, লক্‌নেস হ্রদের তলার গভীর নানা জায়গায় কোনও অজানা প্রাণীর চলাফেরার আভাস আছে।

"জাপানিরা যে আর বেশি কিছু করতে পারেনি তার কারণ নাকি লক্‌নেসের রহস্য উদঘাটনে যা সময় ও পরিশ্রম লাগে, তা প্রায় অশেষ। ছোটখাটো পুকুর-দীঘি তো নয়ই, হ্রদ হিসেবেও বড়। যেমন চল্লিশ মাইল লম্বা, সেই অনুপাতেই গভীর।

"'লক্‌নেস-রহস্যসন্ধানী ব্যুরো' নামে একটি প্রতিষ্ঠান বহুদিন এই ব্যাপারে রহস্যভেদীদের অর্থসাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু অর্থাভাবে সে প্রতিষ্ঠানকেও এক সময়ে নিজেদের দরজায় তালা দিতে হয়।

"এত দিকে এভাবে বাধা পেয়েও লক্‌নেসের রহস্যভেদের চেষ্টা মানুষ ছেড়ে দিয়েছে কি ? না, তা দেয়নি। নানা দিকে নানা সন্ধানী গবেষণায় এই পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুমান করবার ভরসা করছেন যে, একটি দুটি নয়, খুব-সম্ভব অন্তত শ'দেড়েক জলচর দানবাকার প্রাণী লক্‌নেসের গভীরে বর্তমানে বাস করে। বহু প্রাচীন যে সামুদ্রিক প্রাণীর সঙ্গে তাদের মিল থাকতে পারে, সে-প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নাম হল প্লিসিওসোরাস।

"কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে স্কটল্যাণ্ডের এই পাহাড়ি হ্রদে তারা কেমন করে কোথা থেকে এল ? প্লিসিওসোরাস নামের সামুদ্রিক প্রাণীটি তো অন্তত দশ কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। আর স্কটল্যাণ্ডের লক্‌নেসের উদ্ভব হয়েছে দশ হাজারের খুব বেশি বছর আগে নয়।

“লক্‌নেসে প্লিসিওসোরাসের মতো কোনও জলচর দানবাকার প্রাণী থাকতে পারে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা, কোটি কোটি বছর আগে এই অঞ্চলটায় আদি সমুদ্রের একটা অংশ ছিল, আর সেই সমুদ্রের অংশটুকু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে স্কটল্যাণ্ডের এই হ্রদটুকুতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। প্রাচীন সমুদ্রের কিছু প্লিসিওসোরাস বংশের প্রাণীও সেই সময়ে আটকা পড়ে যায় এই হ্রদের মধ্যে।

“হ্রদের মধ্যে আটকা পড়ে কোটি কোটি বছর ধরে যদি তারা টিকে আছে মনে করা যায়, তা হলে তাদের, জীবন্ত তো নয়ই, কোনও শব কি অস্থিও পাওয়া যায় না কেন ? তখন অপরপক্ষ বলেন যে, প্লেসিওসোরাস অত্যন্ত ভীরু গোছের প্রাণী বলে মানুষের সংস্পর্শ তারা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলে। তা ছাড়া, এ প্রাণীটি হয়তো, তাদের মধ্যে যারা মারা যায়, তাদের খেয়েই ফেলে, আর মৃত্যু আসছে এমন লক্ষণ টের পেলে তারা ভারী ভারী পাথর গিলে খেয়ে নিজেদের দেহ অগাধ জলে একেবারে গলে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যাতে ডুবে থাকে তার ব্যবস্থা করে।

“এ-সবই নেহাত মনগড়া অনুমানের বেশি আর কিছু নয়। কিন্তু অনুমানের চেয়ে বেশি কিছু প্রমাণ কি একেবারে নেই ? হ্যাঁ, তা আছে।

“প্রয়োগ-বিজ্ঞানের বোস্টন অ্যাকাডেমি সেই প্রমাণ সংগ্রহের জন্যে চার বছর ধরে লেগে থেকেছে। তাদের যান্ত্রিক সহায় হল গভীর জলের মধ্যে ছায়াছবি তোলার ক্যামেরা, অত্যন্ত শক্তিমান সার্চলাইট আর ক্ষীণতম শব্দতরঙ্গ ধরার মতো অত্যন্ত আধুনিক মাইক্রোফোন। এসব সার্চলাইট আর মাইক্রোফোন পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি গভীর জলের তলায় নামিয়ে রাখার সঙ্গে এমন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল যে, বড় গোছের কোনও কিছু কাছাকাছি এলেই সার্চলাইট আর মাইক্রোফোন আপনা থেকেই চালু হয়ে যাবে।

“১৯৭৫-এর ১০ ডিসেম্বর এই বোস্টন দলের নেতা তাঁর সন্ধানের ফলাফল, আর কোথাও নয়, একেবারে বিলেতের পার্লামেণ্টেই জানাবার ব্যবস্থা করেন। পার্লামেণ্টে সেদিন পাহারার দারুণ কড়াকড়ি, জাল প্রবেশপত্র নিয়ে যাতে কেউ না ঢুকতে পারে। বোস্টন দলের নেতা সেদিন পার্লামেণ্টের সদস্য আর নিমন্ত্রিতদের কী দেখিয়েছিলেন ? দেখিয়েছিলেন কয়েকটা রঙিন আর সাদা-কালো ফোটোগ্রাফের ছবি, যাতে অস্পষ্ট

আকারের কোনও একটা কিছুকে ঝাপসাভাবে দেখা যায়। কল্পনার সাহায্য নিলে ভাবা যায় যে, দলনেতা লম্বা গলা আর লেজসমেত দুটি পাখনাওলা খুদে মাথার বিরাট একটা প্রাণীকে দেখেছেন। বোস্টন দলের ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো কয়েক মিটার দূর থেকে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে বোস্টন-নেতা বলেন যে, দেহটা প্রায় আট থেকে দশ মিটার লম্বা, গলাটা প্রায় তিন থেকে পাঁচ মিটার। সেই প্রাণীটি আদিম প্লিসিওসোরাসেরই বংশধর। হ্রদের মাছ আর জলজ শ্যাওলাই প্রাণীটির খাদ্য। আর লক্‌নেসে মোট একশো পঞ্চাশটি সেরকম প্রাণী এখন আছে বলে তাঁদের ধারণা। বোস্টনের এই প্রথম দলের পর দ্বিতীয় একটি দল এসে আগের দলের মতোই প্লিসিওসোরাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করার পর বৈজ্ঞানিক মহলে সত্যিকার একটা সাড়া পড়ে গেল। বোস্টনের দ্বিতীয় সন্ধানী দল নিজেরাই বিজ্ঞানের সততার মর্যাদা রাখতে লক্‌নেসের রহস্যময় জলচর যে প্লিসিওসরাস হওয়া সম্ভব, সে-বিষয়ে নতুন কিছু প্রমাণ দাখিল করেও, বিজ্ঞানের পরিপূর্ণ সততার মর্যাদা রাখতে, ছোট ডুবোজাহাজ গোছের কিছু দিয়ে আরও কিছু সন্ধানের পরামর্শ দিলেন।

"বৈজ্ঞানিক মহল কিন্তু তখন আর ঘুমিয়ে নেই। যেমন-তেমন নয়, 'লণ্ডন-সান'-এর মতো পত্রিকা একটু বাড়াবাড়ি করেই লিখল যে, বোস্টনের বৈজ্ঞানিক সন্ধানী দল লক্‌নেসের রহস্য-দানবের যে খবর ও ছবিটবি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছে, তা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদের সূত্র আবিষ্কারের মতোই যুগান্তকারী। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের সন্দেহাতীত সম্পূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ কবে পাওয়া যাবে, এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যে যেমন সাধারণ মানুষ, তেমনি বৈজ্ঞানিকেরাও উৎসুক হয়ে আছেন। চেষ্টায় তাঁদের ত্রুটি নেই। কোন্ দিক দিয়ে এই রহস্যভেদের চেষ্টা কে করছেন, তা অবশ্য সম্পূর্ণ গোপনই রাখা হচ্ছে। আসল খবর খুব বেশি না বার হলেও একটা তীব্র উত্তেজনার বিদ্যুৎ-স্পন্দন যেন ছড়াচ্ছে চারদিকে।

"এই পর্যন্ত বলে ছোট কং ও তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, মধ্যোপসাগরের সেই এক ছোট্ট দ্বীপে তোমাদের কাছে দুনিয়ার ফাটকাবাজার ওলটপালট করা সেই এক ধুরন্ধর ধড়িবাজ-চূড়ামণিকে

ধরবার ফরমাশ পেয়ে এদিকে-ওদিকে একটু ঘুরেফিরে বিলেতে হিথরোতে এসে নামবার পরই এয়ারপোর্ট থেকে আমি বুঝতে পারি যে, আমার খোঁজাখুঁজির দায় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।'"

॥ ৫ ॥

একটু থেমে থেকে ঘনাদা বললেন, "মানুষকে চিনতে হয় চরিত্র দেখে। চেহারা ঢেকে রাখা যায়, কিন্তু চরিত্র তো আর ঢাকা যায় না।

"শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মতো আরও অনেকে হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছে, সে-মানুষটার চেহারা যতটা তার চেয়ে বেশি আসল চরিত্রটা আমি তখন প্রায় অঙ্ক কষার মতো গণনায় বুঝে ফেলেছি। ফাটকাবাজারে সে রাশিরাশি টাকা উপায় করবার ফন্দি বার করে, কিন্তু সেটা তার আসল নেশা নয়। নানা বড়-বড় দেশের শহরের কারবারি জগতের কলকাঠি নেড়ে প্রায় যেমন খুশি পয়সা কামাবার অদ্ভুত ক্ষমতা সত্ত্বেও, একবার কোথাও দাঁও মারবার পর কিছুদিন তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। তখন স্বনামে ছদ্মনামে নানারকম দানধ্যানে টাকা ছড়াতে ছড়াতে সে দুঃসাহসিক দুঃসাধ্য কিছু সাধন করবার জন্যে দেশ-দেশান্তরে ঘোরে।

"ডুগান আর কার্ভালোকে বললুম, 'তোমাদের কাছে তার চেহারার যা বর্ণনা পেয়েছিলাম শুধু তাই দিয়ে তাকে চিনে খুঁজে বার করা যে যাবে না, তা আমি জানতাম। তোমরা যে চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলে তা হল সোনালি চুল, নীল চোখ আর একেবারে ধপধপে ফরসা 'নর্ডিক' অর্থাৎ নরওয়ে-সুইডেনের খাস বাসিন্দাদের। কিন্তু সে চেহারা তো খুশিমতো বদলানো যায়! অন্য সব কিছু বাদ দিয়ে শুধু সোনালি চুলগুলো লালচে, গায়ের রঙ ঠিকমতো আরক লাগিয়ে তামাটে, আর চোখের নীল তারাগুলোও কনট্যাক্ট লেন্সের সাহায্যে অনায়াসে ব্রাউন, এমনকী কালোও করা যায়। সুতরাং আমি চেহারা দিয়ে নয়, চরিত্র দিয়েই সেই ধুরন্ধরকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেছি।'

"কিন্তু সেটাও কি সোজা কাজ? লক্‌নেসের জলচর দানবের খবর চালু

হওয়ার পর থেকে দেশ-বিদেশের সন্ধানীরা দলে-দলে ছুটে এসেছে এই অঞ্চলে। স্কটল্যাণ্ডের উত্তরের নির্জন একটা পাহাড়ি শহর আর তার আশপাশের অঞ্চলে গিজগিজ করছে সত্যিকার সন্ধানীদের সঙ্গে হুজুকে মেতে আসা টহলদারের দল।

"স্কটল্যাণ্ডের লোকেদের একটু বেশি হিসেবি আর কৃপণ বলে খ্যাতি আছে। ব্যবসাটা তারা ভালই বোঝে। তাই লক্‌নেসের রহস্য নিয়ে হুজুগটা তারা ভাল করেই কাজে লাগিয়েছে। ছোট শহরের সরু সরু নুড়ি বসানো রাস্তায় সাধারণ দোতলা একতলা সব সেকেলে প্যাটার্নের বাড়ি। যাত্রীদের ভিড়ে সেইসব বাড়ির এক-একটা ঘরের জন্যে বড়-বড় শহরের চার-পাঁচতারা হোটেলের কামরার ভাড়া তারা আদায় করছে। হোটেল-রেস্তোরাঁ দু-চারটে নতুন হয়েছে, কিন্তু তাতে সব সময়ে জমজমাট ভিড়, ভিড় রাস্তায়-ঘাটে আর দোকানে-দোকানে তো বটেই, লক্‌নেসের লম্বা পাড় ধরে কিছু দূর অন্তর পাতা সব তাঁবুতেও। ইউরোপ আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের তো বটেই, আফ্রিকা-এশিয়ার লোকেরও একেবারে অভাব নেই।

"এর মধ্যে আমার সেই লোকটিকে খুঁজে বার করব কোন্ ফুসমন্তরে ?

"ফুসমন্তরে নয়, একটু সজাগ চোখে আর ভাগ্যের একটু দয়া থাকলে সে অসাধ্যসাধনও হয়ে যায়। আমার বেলাতেও হল।

"ইনভারনেসে পৌঁছে কদিন থাকবার জন্যে গলাকাটা ভাড়ার একটি পুরনো সেকেলে বাড়ির দোতলার একটা ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বাড়িটি একটি বয়স্কা স্কট মহিলার। বাড়িটি ভাড়া দেওয়া ছাড়া ইনভারনেসে তিনি শৌখিন জিনিসপত্রের একটি জমজমাট মনিহারী দোকানও চালান তাঁর অন্য একটি বাড়িতে। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস টড্। ইনভারনেসেই তাঁদের বাড়ি। স্বামীর মৃত্যুর পর বছর পনেরো আগে সেখানকার ঘর-বাড়ি-সম্পত্তির একরকম ব্যবস্থা করে তিনি এডিনবরায় শেষ কটা বছর কাটাবার জন্যে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে এই লক্‌নেসের জলচর দানবের রহস্য জমাট বেঁধে উঠতে উঠতে ইনভারনেস শহরের ভাগ্যের চাকাই দিলে ঘুরিয়ে। ঘুঁটেকুড়ুনির হঠাৎ রাজরানী হওয়ার উপমা দিয়েও ভাগ্যের এ পরিবর্তন বুঝি বোঝানো যায় না। লক্‌নেসের অজানা আদিম জলচর দানবের রহস্যভেদের হুজুগে দেশবিদেশের সব

ধনকুবেররা খোলামকুচির মতো ডলার, পাউণ্ড, মার্ক আর ফ্রাঁ ছড়াতে লাগল ইনভারনেসের রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে। এমনিতে সবকিছু দরকারি জিনিস আসলের চেয়ে পাঁচগুণ দামে বিক্রি তো হয়ই, তার ওপর লক্‌নেসের রহস্য-দানবের সঙ্গে একটু সংস্রব থাকলে তো কথাই নেই। সাচ্চা-ঝুটা আসল-নকল লক্‌নেসের 'নেসি' রহস্যের সঙ্গে জড়ানো কোনও কিছু বাজারে দেখা দিতে না দিতেই লুট হয়ে যায় হুজুগে-মাতা খরিদ্দারদের হাতে। কোনও কারণ না থাকলেও ব্যবসাদারেরা সবকিছুতে নেসির একটু ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েই বাজিমাত করে। ইনভারনেসের ট্রেনে আসতে-আসতেই চায়ের ট্রে, টি-পট, কাপ-ডিশ, কেক-বিস্কুট-টোস্ট, সবকিছুতেই নেসি নামে চালু অজানা প্লেসিওসোরাসের একটু ছাপ রাখবার চেষ্টা দেখা যায়। ইনভারনেসের দোকানে-দোকানে নেসির ছাপমারা জিনিসপত্র তো বিক্রি হয়ই, সেইসঙ্গে নেসির বিষয়ে আসল-নকল ছবি, সত্য-মিথ্যা কাল্পনিক বিবরণের বই, নেসিকে শিকারের সরঞ্জাম ও উপায় ইত্যাদি নিয়ে বই রাশি-রাশি বিক্রি হয়। মিসেস টড এই নতুন হুজুগের ঠিক জোয়ারের মুখে ইনভারনেসে ফিরে এসে নিজের সেকেলে বাড়ির ঘরটর একেলে বড় হোটেলের ভাড়ায় বিলি তো করেই দেন, সেইসঙ্গে তাঁর একটি বাড়ির নীচের তলার হলঘরে নেসি মিউজিয়াম নাম দিয়ে একটি দোকানও খুলেছেন এই অজানা জলার দানব সম্বন্ধে যা-কিছু বেচাকেনার জন্যে। হ্যাঁ, প্রত্যক্ষদর্শীদের নেসি সম্বন্ধে বিবরণ, তাদের ফ্ল্যাশ-ক্যামেরায় তোলা নির্ভেজাল বলে দাবি করা নেসির 'যথার্থ ছবি'র প্যাকেট তো বটেই, নেসি সম্বন্ধে আরও যা-কিছু সম্ভব সবকিছু সেখানে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বিক্রিও করা যায় মিসেস টডের কাছে।

"মিসেস টডের স্বামী এককালে ভারতবর্ষে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। মিসেস টডও তখন ছিলেন তাঁর সঙ্গে। ভারতবর্ষে যে ক'বছর ছিলেন, তাতে মিসেস টডের মনে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসী, জ্যোতিষীদের মতো মানুষদের সম্বন্ধে একটা গভীর কৌতূহল আর সম্ভ্রমের ভাব গড়ে উঠেছিল। দেশে ফিরে আসবার পরেও সে ভাবটা তাঁর মন থেকে দূর হয়ে যায় নি। আমি তাঁর বাড়ির একটি কামরা ভাড়া নেওয়ার সময় ভারতীয় বলে জেনে আমায় ক'টি বিশেষ সুযোগসুবিধে তো দিয়েছিলেনই, ভারতীয় যোগবিদ্যা আর জ্যোতিষ ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আর অনুরাগের

কথাও প্রকাশ না করে পারেননি। মিসেস টডের মনের ভাবটা জানা ছিল বলে দিন দুই ইনভারনেসে থাকার পরেই আমি তাঁর কাছে আমার প্রস্তাবটা জানাই। আর কিছু নয়, প্রস্তাবটা শুধু এই যে, তাঁর দোকানে অন্য অনেক কিছু যেমন বিক্রির জন্য রাখা আছে, নেসি সম্বন্ধে আমার একটি বিশেষ রহস্য-সংকেতও আমি তেমনি রাখতে চাই। আমার সে জিনিসটি রাখবার জন্যে আমি অবশ্য তিনি যত চান সেই দৈনিক ভাড়াই দেব। কিনতে চাওয়া খরিদ্দারদের জন্যে আমার দেওয়া রহস্য-সংকেতের একটা দাম ঠিক করা থাকবে। কোনও খরিদ্দার সেই দাম দিয়ে সংকেতটি কিনলে মিসেস টড তাঁর প্রাপ্য দোকানভাড়া তা থেকে কেটে নিয়ে বাকিটা আমায় দেবেন,এই হল আমাদের মধ্যে চুক্তি। আমার রহস্য-সংকেত বিক্রি না-ও হতে পারে বলে আমি হপ্তাখনেক তা দোকানে রাখবার ভাড়া মিসেস টডকে অগ্রিম দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তা নেননি।

"আশ্চর্যের কথা এই যে, আমার রাখা তিন-তিনটি রহস্য-সংকেত দোকানে রাখবার পর দু'দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। যে তিনজন আমার দিয়ে রাখা সংকেত প্রায় আকাশছোঁয়া চড়া দামে কিনে নিয়ে যায়, তাদের তিনজনকেই আমি মিসেস টডের অনুগ্রহে দোকানের মধ্যে অন্য জায়গা থেকে লক্ষ করবার সুযোগ পাই, এবং আমার ধারণা, অত্যন্ত নিপুণভাবে ছদ্ম চেহারায় সেজে এলেও তাদের মধ্যে আসল ধুরন্ধরকে চিনতে আমার ভুল হয়নি।

"আমার রহস্য-সংকেত যারা কিনেছে, আর একদিন বাদে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে তাদের এক-একজনের আমার সঙ্গে একটি বিশেষ ঠিকানায় দেখা করবার কথা। ওই বিশেষ দেখা করবার ঠিকানাটা মিসেস টডের অনুগ্রহে পাওয়া গেছে। রহস্য-সংকেত দেওয়া কাগজটির মধ্যে ঠিকানাটি জানিয়ে দেখা করবার সময়ও প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেওয়া আছে। সেই ঠিকানা ও সময়ের নির্দেশ ছাড়া রহস্য-সংকেত আর যা ছিল, তা শুধু একটি সংস্কৃত শ্লোকের অংশ। আর তার চারপাশে জ্যোতিষের কয়েকটা চিহ্নের সঙ্গে একটা জিজ্ঞাসা। যেমন,

নেসির রহস্যভেদ করতে শুনুন:
প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্...

"গীতগোবিন্দের সংস্কৃত শ্লোকটার কিছুটা আবৃত্তি করবার পর শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোকে বললাম, 'তোমাদের হয়ে যাকে খুঁজছিলাম, সে ধুরন্ধরকে আমার এই নতুন প্যাঁচে ছাড়া ন'মাসে-ছ'মাসেও খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। কিন্তু আমার এই ফন্দিতে আমার বদলে সে-ই যাতে আমায় খোঁজে তার ব্যবস্থা করে কাজটা অনেক সহজ করে ফেলেছি। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ইনভারনেসে পৌঁছতে আমাদের ঘণ্টা-দেড়েকের বেশি দেরি নেই। সেখানে পৌঁছে আমার বাসাতেই তোমাদের নিয়ে যাব, তারপর তৈরি হয়ে এক-এক করে আমাদের তিন মক্কেলের সঙ্গে ...'

"ব্যস, ওই পর্যন্ত বলার পর একেবারে বেহুঁশ হয়ে ট্রেনের কামরার সিটের ওপরেই লুটিয়ে পড়লাম।

"শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো এরপর যা করল এবার তা-ই বলি।

"আমি কামরায় আসনের ওপর হাত-পা এলিয়ে পড়ে যাবার পরেই ডুগান আর কার্ভালো দু'জনে চটপট উঠে দাঁড়িয়েছিল।

"আমার দিকে চেয়ে কার্ভালো তার মুঠো করা ঘুসিটা আমার মাথার কাছে একটু নেড়ে বললে, 'দেব আর একটা ঘা ?'

"'না, তার দরকার হবে না মনে হচ্ছে,' বলল শুঁটকো ডুগান, 'একটা মোক্ষম ঘায়েই যা ঘায়েল হয়েছে, দুটোয় একেবারে কাবার না হয়ে যায় ! এমনিতেই কাজ হাসিল হলে সে-সব হাঙ্গামায় যাওয়ার দরকার কী ? এখন চটপট হাত-পাগুলো বেঁধে মুখে রুমাল গুঁজে দাও দিকি। পকেটগুলো হাতড়ে যা পাও তা আগে বার করে নিতে অবশ্য ভুলো না।'

"ডুগানের নির্দেশমতো কার্ভালোর কাজ সারবার মধ্যে ট্রেনটা একটা স্টেশনে একটু থামে।

"তখন প্রায় শেষ রাত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মটা আলোয় ঝলমল করলেও একেবারে নির্জন।

"স্টেশনে থামবার আগে গাড়িটার গতিবেগ একটু কমতে দেখেই বুদ্ধিটা শুঁটকো ডুগানের মাথায় আসে নিশ্চয়। তাদের গাড়িটা থামবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরের দরজাটা খুলে ফেলে সে বলে, 'শিগগির। ওর হাত-পা বাঁধা, মুখে রুমাল-গোঁজা পোঁটলাটা দাও এই প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে।'

"গোরিলা কার্ভালো তাই যখন করতে যাচ্ছে, তখন শুঁটকো ডুগানের মাথায় আরও ভাল একটা বুদ্ধি আসে। আলোয় ঝলমল অথচ একেবারে নির্জন প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকে একটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এ-প্ল্যাটফর্মের দিকে আসার পথেই ওদিকের মালগাড়ির ইঞ্জিনটা দেখা গেল বলেই, সেটা যে উলটো মুখে যাচ্ছে তা বোঝা গেছিল নিশ্চয়। ডুগান তাই আবার মতটা পালটে ব্যস্ত হয়ে হুকুম দিলে, 'না, প্ল্যাটফর্মে নয়। ওধারের মালগাড়িটার প্রায় সব কোচগুলোই খালি মনে হচ্ছে। ওর একটায় ওটাকে ফেলে এসো।'

"কার্ভালোর এই হুকুম তামিল করতে দেরি হল না। প্ল্যাটফর্মের ওদিক থেকে কাজ সেরে আসতে আসতেই তাদের গাড়িটা ছেড়ে দিলেও, ছুটে এসে নিজেদের কামরায় উঠতে তার অসুবিধে হল না। 'শাবাশ!' বলে তাকে তারিফ জানিয়ে ডুগান বললে, 'যাক, এখন হপ্তাখানেকের জন্যে অন্তত নিশ্চিন্ত থাকব বলতে পারি। দু-চার ঘণ্টা বাদে জ্ঞান যদি হয়ও, কোথায় গিয়ে যে হতভাগা জাগবে তার কোনও ঠিক নেই।'

॥ ৬ ॥

চা এসে গিয়েছিল। ধীরেসুস্থে চা শেষ করে, সিগারেট ধরিয়ে, ঘনাদা ফের শুরু করলেন তাঁর গল্প: "ভোর হবার পর ইনভারনেস স্টেশনে গিয়ে নামবার আগে ট্রেনের কামরায় আমার জামা আর প্যান্টের পকেট থেকে পাওয়া কাগজপত্র ইত্যাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে নিয়ে তারা অন্য দু-চারটে দামি খবরাখবরের সঙ্গে মিসেস টডের দোকানের হদিস আর তাঁর কাছে আমার ভাড়া-নেওয়া কামরাটার ঠিকানা আর 'ল্যাচ-কি' হাত করতে পেরেছে।

"তারা তখনই মিসেস টডের দোকানে কি আমার ভাড়া-নেওয়া তাঁর বাড়ির কামরায় যায়নি। স্টেশনের একটি ওয়েটিংরুমেই সারারাত্রির ট্রেনযাত্রার পর একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নিয়ে, শহরটায় একটু ঘুরে দরকারি ঠিকানাগুলো জেনে নিতে বেরিয়েছে।

"আমার জামা ও প্যান্টের পকেট থেকে যেসব কাগজপত্র তারা বার

করে নিয়েছিল, তার মধ্যে একটা বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপার না থাকলে তারা হয়তো তখনকার মতো লন্ডনে ফিরে গিয়ে এখানকার বোঝাপড়ার জন্য একটু তৈরি হয়ে আসবারই চেষ্টা করত। কিন্তু সে সময় তখন তাদের নেই।

"তাদের কাছে অমন বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপারটা যে কী, তা বোধহয় বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। হ্যাঁ, ভারতীয় জ্যোতিষী হিসেবে সংস্কৃত শ্লোক দিয়ে শুরু করা মিসেস টডের দোকানে রাখা আমার সেই রহস্য-সংকেতগুলি কিনে যারা পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করবার দিনক্ষণ লিখিয়ে নিয়েছিল, সেই তিনজন অজানা রহস্য-সন্ধানীর সাক্ষাতের আশাটাই ছিল ডুগান ও কার্ভালোর কাছে দুর্নিবার আকর্ষণ। ব্যাপারটা নেহাত হুজুগের প্রলোভনের চেয়ে বেশি কিছু যাতে হয়, তারই জন্যে সংস্কৃত শ্লোক দেওয়া রহস্য-সংকেত আর তার দরুন সুবিধের জন্যে দামটা ধরা ছিল প্রায় গলা-কাটা। সংস্কৃত শ্লোক লেখা ভারতীয় জ্যোতিষের চিহ্ন আঁকা এক-একটা রহস্য-সংকেতলিপির দামই ধরা ছিল পাঁচ পাউন্ড করে। সেই রহস্য-সংকেত কেনবার পর তারই জোরে মূল যোগী-জ্যোতিষীর সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ আর তার নির্দিষ্ট সময় স্থির করে জেনে নেবার জন্যে আরও দশ পাউন্ড খরচ।

"শতকরা নিরানব্বুইজনই যে ব্যাপারটা বুজরুকি আর ধাপ্পা বলে ধরে নিয়ে কাছে ঘেঁষবে না, তারই জন্যে যে তিনজন নিজে থেকে অমনভাবে এগিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যেই ধড়িবাজ-চূড়ামণি, দুনিয়ার ফাটকা-বাজারের বাজিকর ভোজরাজকে পাওয়া যাবে, আমার দেওয়া এই ইঙ্গিত শুটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালোর মনে বিশেষ করে ধরেছিল।

'তাই লন্ডনে ফিরে না গিয়ে একটু বেলা হবার পর তারা প্রথমে মিসেস টডের দোকানটা সাধারণ খরিদ্দার হিসেবে একটু দেখে নিয়ে সেখান থেকে আমার ভাড়া-করা বাসাটা খুঁজে বার করে আমার পকেট ঘেঁটে পাওয়া ল্যাচ-কি' দিয়ে আমার কামরাটা খুলেছিল।

"ছোট একটা বাসা। কিন্তু ব্যবস্থাটা তাদের পছন্দ হয়েছিল। ভারতীয় যোগী-জ্যোতিষীদের সঙ্গে দেখা করবার সুবিধের জন্যে যে তিনজন অত চড়া দামের টিকিট কিনেছে, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত পর পর তাদের আধ ঘণ্টা করে দেখা দেওয়া তো যাবেই, তারপর অবস্থাটা যেমন

দাঁড়ায় সেইমতো এই কামরাটাই সেদিনকার রাতের মতো নিজেদের কাজে তারা ব্যবহার করবে।

"কিন্তু মুশকিল হল একটা সমস্যা নিয়ে। গোরিলা কার্ভালো সেটা তুলে ভাবনায় ফেললে। কী এক বিদঘুটে হরফের ভারতীয় ভাষায় রহস্য-সংকেতের কাগজগুলোয় যা লেখা আছে, তার কী ব্যাখ্যা তারা করবে, তা-ই জানবে যারা আসছে তাদের কাছে ? রহস্য-সংকেতের টিকিট নিয়ে যারা আসছে, তাদের মধ্যে নিজেদের শিকারকে খুঁজে বার করা তাদের আসল কাজ। কিন্তু সে-কাজ সারবার জন্যেই পর পর এক-একজনকে ডেকে পাঠাতে হবে। উত্তরও দিতে হবে তাদের জিজ্ঞাসার। সে-জিজ্ঞাসা কী বিষয়ে হবে, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু উত্তরটা কী তারা দিতে পারে ?

"ঠিক আছে। শুঁটকো ডুগানই বুদ্ধিটা বাতলালে। আসছে তো পরপর তিনজন। তাদের মধ্যে নিজেদের শিকারকে খুঁজে নেওয়াই হল ডুগান আর কার্ভালোর উদ্দেশ্য। যাকে তারা খুঁজছে, সেই ধুরন্ধর যদি প্রথমেই আসে তা হলে তো সব সমস্যা ওখানেই মিটে যাবে। আসল মানুষটিকে কব্‌জা করে বাকি দুজনকে তারা বিদায়ই করে দেবে সরাসরি। কিন্তু অত সুবিধে যদি না-ই হয়, তাতেই বা কী ? টিকিট নিয়ে যারা আসছে, তাদেরকেও, আসল শিকার না হলে, দেখা করতে আসার আর-একটা দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেই চলবে। বললেই হবে যে, ভারতীয় জ্যোতিষের গণনা বড় কঠিন। আরও কিছু সময় লাগবে তা শেষ করতে। সেই জন্যে আর-একটা তারিখ মায় সময় ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে।

"নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা ঠিক করে নিয়ে দুজনে এর পর দুপুরের লাঞ্চ সেরে আসবার জন্যে কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের একটি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল।

"ফিরে এসে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলা দেখে তারা অবাক। দরজা খোলা হলেও ভেজানো ছিল ভেতর থেকে। সে দরজায় ঠেলা দিয়ে খুলে তারা একেবারে তাজ্জব।

"তা তাজ্জব হবারই কথা। সেখানে আর কাউকে নয়, আমাকেই বসে থাকতে দেখার কথা তারা কল্পনাও করেনি।

"'তুমি··· তুমি···' কার্ভালো প্রায় তোতলা হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল।

"'হ্যাঁ, আমি,' আমি একটু হেসে বলেছিলাম, 'অশরীরী ছায়াটায়া নয়, একেবারে সশরীরে হাজির। আর তাও বেশ অনেকক্ষণ থেকে আছি। আর তাই আছি বলেই তোমাদের পরামর্শটা জেনে গোলমেলে প্রশ্ন এড়াবার বুদ্ধিটার তারিফ করছি।'

"তারিফ করছ আমাদের বুদ্ধির ?' গোরিলা কার্ভালোর মাথায় কথাটা যেন ঠিক ঢুকছে না।

"'কী জন্যে তারিফ করছি ?' শুঁটকো ডুগানের এবার কড়া গলায় সোজাসুজি প্রশ্ন, 'কী জানো আমাদের পরামর্শের ?'

"'তোমরা যা বলেছ, তার বেশি আর কী করে জানব ?' যে সোফাটায় বসে ছিলাম, তার একটা পায়ার পেছন থেকে কিছু একটা প্যাঁচ দিয়ে খুলতে-খুলতে আমি বললাম, 'মক্কেলদের বেয়াড়া প্রশ্ন এড়াবার জন্যে ভারতীয় জ্যোতিষ-গণনা কঠিন বলে যে দোহাই পাড়ার কথা তোমরা বলাবলি করেছিলে, সেইটে শুনেই তোমাদের বুদ্ধির প্রশংসার কথা মনে হয়েছিল। আর...'

"আমার কথার মধ্যেই থামিয়ে দিয়ে যেমন উত্তেজিত, তেমনি কেমন একটু হতভম্বভাবে কার্ভালো বললে, 'কিন্তু আমাদের কথা তুমি শুনলে কী করে ? তখন এখানে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ তো ছিল না!'

"'তা ছিল না বটে,' আমি যেন বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম।

"'তবে ?' প্রায় গর্জন করে উঠল কার্ভালো, 'আমাদের পরামর্শের কথা তুই...'

"আপনি তো নয়ই, সম্বোধন তুমি থেকে তুই-এ নামাতে কার্ভালোর গায়ের জ্বালা কত সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, তা বোঝা গেল। তার কথার মাঝখানে তাই বাধা দিয়ে বললাম, 'সাবধান! সাবধান! হঠাৎ অত গরম হয়ে উঠলে স্ট্রোক হয়ে যেতে পারে। তোমাদের কাছে যা ধাঁধা, তার উত্তরটা তাই শুনিয়ে দিচ্ছি। আমি নিজে সশরীরে এখানে উপস্থিত না থাকলেও—না, আমার আত্মাটাত্মা নয়, আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই যন্ত্রটা এখানেই সোফার পায়ার পেছনে লুকিয়ে লাগানো ছিল। দেখতে খুদে হলে কী হয়, এই রেকর্ডার যন্ত্রটা দারুণ কাজের। তোমাদের সব কথা তাই স্পষ্ট করে ধরে রেখেছে।

"'ধীরে বন্ধু, ধীরে!' কার্ভালো আবার লাফিয়ে ওঠার উপক্রম করতেই

তাকে একটু ঠেলা দিয়ে তার আসনে বসিয়ে দিয়ে বললাম, 'এ-যন্ত্র এখানে কেমন করে এল, এই তো জানতে চাও ? বলছি শোনো। না, কোনও ভোজবাজিতে এটা এখানে আসেনি। আমিই ওটা এখানে লাগিয়ে রেখেছিলাম। কখন লাগিয়ে রেখেছিলাম ? তোমরা এখানে এসে এ-বাসার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে সব দেখেশুনে নিয়ে একবার কিছুক্ষণের জন্যে দরজার ল্যাচ-কি লাগিয়ে বাইরে গেছলে। আমি সেই সুযোগেই এসে এটা লাগিয়ে রেখে গিয়েছিলাম।... কিন্তু আমি ঠিক সেই সময়ে এখানে এলাম কী করে, এই ধাঁধাটার উত্তর পাচ্ছ না, কেমন ? উত্তর শুনতে হলে একটু ধৈর্য ধরে খানিকক্ষণ শুনতে হবে। হ্যাঁ, ট্রেনের কামরায় আমার গর্দানে গোরিলা কার্ভালো যখন একটা রামরদ্দা চালায়, সেই তখন থেকে যা হয়েছে সব।

"'মোক্ষম রদ্দাই চালিয়েছিলে বটে তুমি, মানে গোরিলা কার্ভালো। ও রদ্দা খেয়ে আমার সত্যিই বেহুঁশ হবার কথা। কিন্তু তা যে আমি হইনি, তার কারণ তোমাদের মতো পেঁচি বদমাশদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। তাই তোমাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে-চালাতে চোরা নজরটা আমি ঠিকই রেখেছিলাম তোমাদের ওপর। মাথায় রামটুসকির ধাক্কা সামলে উঠে আর একটা রামরদ্দা পাড়বার জন্যে মুঠো পাকানো থেকে হাত চালানো পর্যন্ত সবই আমি সজ্ঞানে ঘটতে দিয়েছি। রদ্দাটাকে এমন তাল মিলিয়ে ঘাড়ের ওপর নিয়েছি যে, মনে হয়েছে, তাইতেই আমি কাত আর বেহুঁশ হয়ে গেলাম। গোরিলা কার্ভালোর অবশ্য আর একটা রদ্দা দিয়ে জখমটা পাকা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কার্ভালো তা করতে গেলে ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে খেলাটা অন্যভাবে সাজাতে হত। তোমার, মানে শুঁটকো ডুগানের সুপরামর্শে তার অবশ্য দরকার হয়নি।

"'আমার পকেট-টকেট থেকে যা হাতড়াবার হাতড়ে আমায় বাঁধাছাঁদা করে, মুখে রুমাল গুঁজে বোবা করার ব্যবস্থার মধ্যে ট্রেনটা মিনিট খানেকের জন্যে একটা স্টেশনে থেমেছিল। এইটাই একটা পরম সুযোগ মনে করে প্রথমে আমায় নির্জন প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিয়ে যাওয়ার মতলব করে পরে আবার তা পালটে প্ল্যাটফর্মের অন্য দিকের থেমে থাকা একটা উলটোমুখো মালগাড়ির একটা ফাঁকা কোচে ফেলে দিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলে। কিন্তু ধর্মের কল সত্যিই কখনও বাতাসে নড়ে। তোমাদের দেখা

উলটোমুখো মালগাড়ি আমার খাতিরে সোজা-মুখো হয়ে গিয়েছিল খানিকবাদে। মালগাড়ির মাথার থেকে সেটাকে সামনে টেনে নিয়ে যাওয়ার বদলে সেটা পিছন দিক থেকে গাড়িটাকে ঠেলে ইনভারনেস স্টেশনের মাল খালাসের রেলইয়ার্ডে পৌঁছে দিয়েছে।

"'পৌঁছে দিয়েছে রেল কোম্পানিরই নিজেদের দরকারে নিশ্চয়, পৌঁছেছে তোমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের অনেক পরে। কিন্তু তাতে আমার লাভই হয়েছে। যে খোলা-দরজার মালগাড়িটায় আমায় পুঁটলির মতো বেঁধে ফেলে আসার বন্দোবস্ত করেছিলে, তাতে তোমাদের গাড়ি ছাড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমি আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ফেলে উঠে বসেছিলাম। ইচ্ছে করলে মালগাড়িটা থেকে নেমে একটা ছুট দিয়ে তোমাদের গাড়িটার পেছনের কোনও কামরায় উঠতেও হয়তো পারতাম, কিন্তু সে চেষ্টা করিনি।

"'তার বদলে বেশ একটু দেরিতে স্টেশনের যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে নয়, মাল খালাসের গুডস্‌ইয়ার্ডের এক জায়গায় ধীরেসুস্থে নেমে সেখান থেকে শহরে বেরিয়ে এসে তোমাদের খোঁজ করাটা সহজই হয়েছে।

"'এদিক-ওদিক ঘুরে তোমরা তখন মিসেস টডের দোকানটা খুঁজে বার করে সেখানে ঢুকেছ। সেখান থেকে বেরিয়ে তোমরা আমার ভাড়া-নেওয়া এই বাসাটা খুঁজে বের করে এখানে আসার সময় আমি যে আগাগোড়া তোমাদের পেছনে ছিলাম, তা তোমরা টের পাওনি। পাও না পাও, লোকসান তাতে তোমাদের এমন কিছু হয়নি। এখন তোমাদের আসল কাজ যদি উদ্ধার হয়, তা হলে আর আফসোসের কিছু নেই।

"'ঘড়িতে দেখছি তোমাদের মক্কেলদের আসবার সময় হয়ে গেছে। আমি তা হলে এখনকার মতো বাইরে যাচ্ছি...'

"'না', গর্জন করে উঠল কার্ভালো।

"যাবার জন্যে উঠে পড়েও আমি আবার সোফার উপর বসে পড়লাম। তবে সেটা গোরিলা কার্ভালোর গর্জনের জন্যে নয়, এমনকী কোমরের বেল্ট থেকে যে পিস্তলটা টেনে বার করে সে তখন আমার দিকে তুলে ধরেছে, তার জন্যেও নয়। তবে পিস্তল উঁচিয়ে ধরবার মতো স্পর্ধা যার হয়েছে, তার দৌড় কতটা তা আমি তখন দেখতে চাই।

"বেশ একটু ভয়ের ভান করে তাই আমি চটপট আবার বসে পড়ে

কাঁপা-কাঁপা গলায় যেন নালিশ জানালাম, 'পিস্তল-টিস্তল দেখানো, এ আবার কী ! সোজাসুজি আমায় এখান থেকে যেতে বারণ করলেই তো হয় । তাছাড়া আমায় এখানে ধরে রেখে তোমাদের লাভটা কী ? তোমরা কাকে খুঁজছ না খুঁজছ তা কি আমি জানি ?'

"ভয় পাওয়ার অভিনয়টা আমার ভালই হয়েছিল বোধহয় । কারণ, এর আগে বারকয়েক নাকাল হবার পর নিজের জবরদস্ত শাসানির ফল এবারে যেন হাতে-হাতে পেয়ে কার্ভালো তখন মুখে যেন বাঁকা হাসি মাখিয়ে পিস্তলটা ডান হাতে একটু ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'না, তুই কিছুই জানিস না । তবু তোকে কেন ধরে রাখছি, তা বুঝতে পারছিস না ? তোকে ধরে রাখছি, যাতে এখন বাইরে গিয়ে তুই আমাদের মক্কেলদের কোনওরকম ভাঙচি না দিতে পারিস ।'

"'ভাঙচি দেব আমি ?' সত্যিই একেবারে আকাশ থেকে পড়ে আমি বললাম, 'কী ভাঙচি আমি দিতে পারি ? আর দিয়ে আমার লাভটা কী, তাই তো বুঝতে পারছি না ।'

"'অত কথা জানি না ।' কার্ভালোর আগে শুঁটকো ডুগানই এবার খিঁচিয়ে উঠল, 'তোমায় এখানে থাকতে বলা হয়েছে । তা-ই তুমি থাকবে । এ-নিয়ে তর্ক করবার আর আমাদের সময় নেই ।'

"'বেশ, তোমাদের হুকুমই মানছি !' অসহায় ভাবে ওদের কথা যেন মানতে বাধ্য হয়ে বললাম, 'কিন্তু থাকব কোথায় ? এই এখানে, তোমাদের সঙ্গে ? সে কি ঠিক হবে ?'

"' না, তা হবে না,' কার্ভালো গর্জন করে উঠল, 'আমাদের মধ্যে নয়, তুই থাকবি ওই...ওই...'

"এদিক-ওদিক চেয়ে ঘরের ওয়ার্ডরোবটার দিকে চোখ পড়ায় সে খুশি হয়ে বললে, 'তুই থাকবি ওই ওয়ার্ডরোবের ভেতরে ।'

"থাকবার জায়গার নির্দেশ দিয়ে গোরিলা কার্ভালো সাবধানও করে দিলে সেই সঙ্গেই, 'ওখানে থাকবি, কিন্তু একেবারে সাড়াশব্দ না দিয়ে । ওখান থেকে কোনওরকমে বেয়াড়াপনার চেষ্টা করলে লুকিয়ে চোর ঢুকেছে মনে করার ছুতোয় পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে একেবারে ঝাঁঝরা করে দেব, মনে থাকে যেন ।'

"ওয়ার্ডরোবের ভিতর বা যেখানেই হোক, ওই কামরার মধ্যে উপস্থিত

থাকবার সুযোগ পাওয়াটাই তখন আমার কাছে মস্ত লাভ।

"সময় তখন হয়ে গেছে। কার্ভালোর সঙ্গে কোনও রকম তর্ক আর না করে সুবোধ ছেলের মতো ওয়ার্ডরোবের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। ছোটখাটো নয়, আমার মতো মানুষের বেশ স্বচ্ছন্দে থাকবার মতো প্রশস্ত জায়গা। আমাদের এখানে হলে ভ্যাপসা গরমে কষ্ট পাবার ভয় হয়তো ছিল। কিন্তু উত্তর স্কটল্যাণ্ডের তখনকার শীতে কোনওরকম কষ্টই হয়নি।

"কিন্তু যার জন্যে এতসব আয়োজন, সেই আসল কাজটাই যে গেল পুরোপুরি ভেস্তে। যাদের আসবার কথা তারা পর পর সময়মতো তিনজন ঠিকই এসেছে। কিন্তু এই নিষ্ফল আসার হয়রানির জন্যে গালমন্দ দিয়ে ঝগড়া যে কেউ তারা করেনি, সে নেহাত ওদেশের সহবত শিক্ষার গুণেই বলে মনে হয়।

"যে তিনজন এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বয়স্কা মহিলা, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, আর তৃতীয়জন কিছুটা কম বয়সের, অবসর-নেওয়া মিলিটারি অফিসার বলেই মনে হয়।

"ওয়ার্ডরোবের দরজার চাবির ফুটোটা আমি আমার চাবির রিং-এ পরানো খুদে ছুরির ফলা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে একটু বড় করে নিয়েছিলাম। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চেহারাগুলো দেখতে আর কথাগুলো শুনতে বিশেষ কিছু অসুবিধে তাই হয়নি।

"চেহারাগুলোর তফাত থাকলেও কথা তিনজনে যা বলেছে, তা সম্পূর্ণ একই বলতে হয়।

"তাদের প্রথম জিজ্ঞাসা হল, তাদের কাছে বিক্রি করা রহস্য-সংকেতের কাগজে ভারতীয় ভাষায় যা লেখা আছে তার অর্থটা কী ? আর সেটা যদি জ্যোতিষ গণনার মন্ত্র হয়, তা হলে তার সাহায্যে কি হদিস পাওয়া গেছে লকনেসের জল-দানবের রহস্যের ?

"দুই মূর্তিমান, শুঁটকো ডুগান আর গোরিলা কার্ভালো যে কোনও জবাবই এই দুটি প্রশ্নের দিতে পারেনি, তা বোধহয় বলতে হবে না। সময় লাগার অজুহাত যে তারা দেখিয়েছে, তা মানতে কেউ রাজি হয়নি। রহস্য-সংকেত জানবার জন্যে প্রার্থীদের দেওয়া মোটা দর্শনী তাই ফেরত দিতে হয়েছে ডুগান আর কার্ভালোকে।

"তাতে তারা খুব দুঃখ পেয়েছে কি ?

"না, তা পাবার তো কথা নয়। কারণ, আসল যা কাজ তা তাদের হাসিল হয়ে গেছে। সংকেতলিপির রহস্য জানতে যারা আসবে, কাছ থেকে তাদের খুঁটিয়ে দেখাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। সে-দেখার সুযোগও তাদের রয়েছে।

"তবু তারা খুশি নয় কেন ? তারা যাকে খুঁজছে সংকেতলিপির মানে বুঝতে চাওয়া তিন উমেদারদের মধ্যে সে কি ছিল না ? ছদ্মবেশেও কি নয় ?" কথাটা জিজ্ঞেস করেছি আমি বেশ একটু হতাশ গলাতেই।

"'না, না, নেই !' এবার ডুগানই খিচিয়ে উঠে বলেছে, 'তোমার জন্যেই বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করে আমাদের এই নাকাল হওয়া। কিন্তু আমার ডালকুত্তার নাক। একটু গন্ধ যখন পেয়েছি, তখন যেমন করে হোক আজ নাহয় কাল খুঁজে বার করবই।'

"'খুঁজে বার করবেই ?' যেন সত্যি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'তা হলে আসল বাসাটা বার করতে না পারলেও কোন্ মুলুকে সে চরে, সেটার হদিস দেবার বাহবাটা আমায় দাও।'

"'হ্যাঁ, দেব, দেব। তার জন্যে তোর গলায় মেডেল ঝুলিয়ে দেব।'

"'মেডেলের আগে বকশিশ পেলে কিন্তু সুবিধে হত আমার।' আমি একটু যেন মিনতির সুরে বলেছি।

"'বকশিশ! তুই বকশিশ চাইছিস ?' একেবারে যেন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠেছে কার্ভালো। তারপর আমার ওয়ার্ডরোবে গিয়ে ঢোকার পর কোমরের বেল্টে গুঁজে রাখা পিস্তলটা আবার টেনে বার করে আমার দিকে উঁচিয়ে ধরে বলেছে, 'তোর খুলিতে একটা কি দুটো হাওয়া খেলবার ফুটো করে দেওয়াই এখন তোর উপযুক্ত বকশিশ, তা জানিস কি ?'

"'না, না, ওসব কী অন্যায় কথা ! আমি...আমি...' প্রায় করুণ স্বরে বলেছি, 'তোমাদের আসল কাজ এমন করে হাসিল করে দেবার পর মাথার খুলি ফুটো করতে চাওয়াটা...'

"'থাম, থাম।' অধৈর্যের উত্তেজনায় আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গোরিলা কার্ভালো গর্জে উঠেছে, 'আমাদের সঙ্গে ঠক্‌বাজি করিস, এত বড় তোর সাহস। এই অখদ্যে শহরে আনা ছাড়া কী কাজ তুই আমাদের করেছিস ? বড়াই করছিস কী আসল কাজের ?'

"'কী আসল কাজ তা এখনও বুঝতে পারোনি ?' আমি রীতিমত
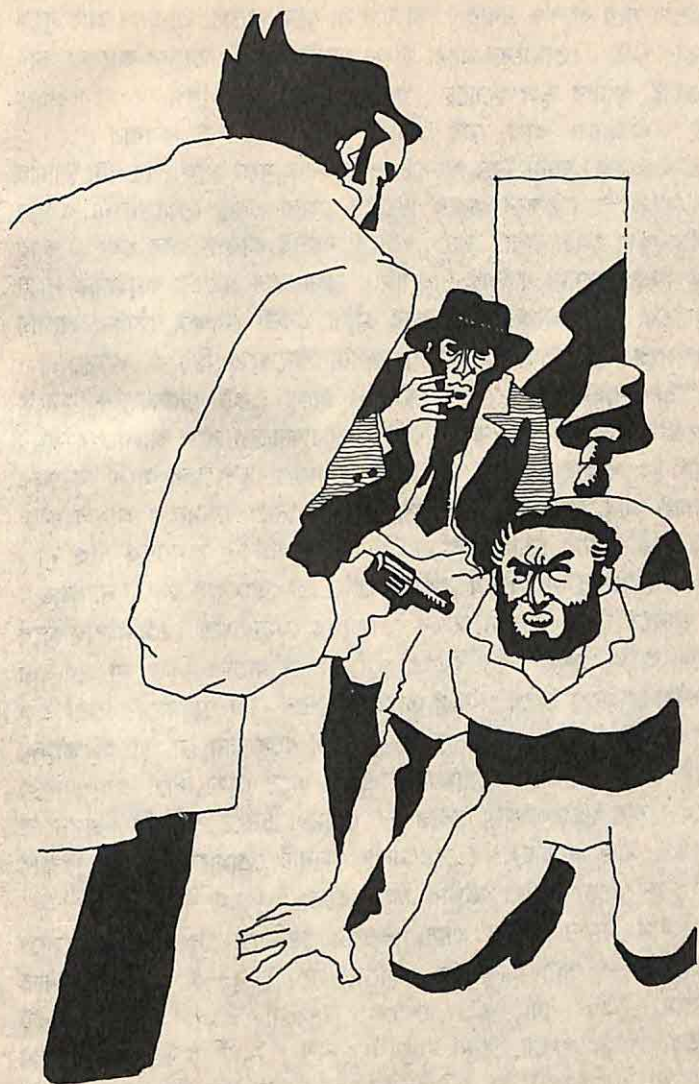
হতাশার সুরে বলেছি এবার। 'তা যদি না বুঝে থাকো, তা হলে আর বুঝে দরকার নেই। তোমাদের মতো মগজ যাদের নিরেট, তাদের কাজের ভার নেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। যাক্, তোমাদের বকশিশ দেবার দরকার নেই। আমারও কাজ নেই এখানে আর সময় নষ্ট করবার।'

"'খবরদার,' আমি উঠে পড়বার ভঙ্গি করার সঙ্গে-সঙ্গে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে কার্ভালো বজ্রস্বরে ধমকে দিয়েছে, 'আর একটু বেয়াড়াপনা করলে মাথার খুলি ফুটো করার আগে পাঁজরা দুটোই ঝাঁঝরা করে দেব!' আর কিছু বলার সুযোগ কার্ভালো পায়নি। তার ডান হাতের কনুইয়ের নীচে বিদ্যুতের বেগে আমার বাঁ পায়ের হাঁটুর একটা মোক্ষম ঠোক্কর লাগার সঙ্গে-সঙ্গে হাতটা অবশ হয়ে পিস্তলটা মেঝেতে ছিটকে পড়েছে।

"তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে নিয়ে ডান হাতে একটু লোফালুফি করতে করতে বলেছি, 'এসব বেয়াড়া জিনিস বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলাপের সময় কাছে না থাকাই ভাল। আলাপটা আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে কাজের ফরমাশ আর তার জন্যে বকশিশের দরাদরি নিয়ে, কেমন? আসল কাজ কিছু করিনি বলে তোমরা আমার বকশিশের দাবিটা মানতেও চাও না। এমনকী, আসল কাজ যে কী আমি করেছি, তা তোমরাও জানো না বলছ! তা জানতে যখন পারোনি, তখন তোমাদের যেমন আছ তেমনি অন্ধকারে রেখে আমি এখন চলে যেতে পারি। তোমাদের কিছু না বোঝার ছটফটানির মধ্যে রেখে। কিন্তু তা আমি করব না। তোমাদের অন্য এক জাতের ছটফটানির মধ্যে রেখে এইটুকু শুধু বলে যাব যে, যাকে তোমরা খুঁজছ সে আজ এখানে তোমাদের সামনে এসে দেখা দিয়ে কথাও বলে গেছে। তার ছদ্মবেশ আর চেহারা শুধু তোমরা চিনতে পারোনি। এখন যে তিনজন আজ এসেছিল, তাদের মধ্যে কোন্‌টি তোমাদের আসল শিকার তা ভেবে বার করতে মাথার চুল ছেঁড়ো। আমি চললাম।'

"আমি ঘরের বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে প্রায় আকুল আর্তনাদের মতোই দুই মূর্তিমানের মিনতি শুনলাম, 'এই যে, এই শোনো, শোনো…'এরপর আর একটু খাতির-মাখানো গলায়, 'শুনুন, শুনুন মিঃ দাশ!' মিনতির উত্তরে গুলি বার করে নেওয়া পিস্তলটা শুধু বাইরের দরজার ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আমি একটা গলি-পথে বাঁক নিয়ে চলে গেলাম।

॥ ৭ ॥

ঘনাদা বললেন, "রহস্য-সংকেতের কাগজ নিয়ে তার অর্থ বোঝার জন্যে যে তিনজন খানিক আগে আমার **ডেরায়** এসেছিল, তাদের মধ্যে আসল ধুরন্ধরকে আমি চিনতে পেরেছি মনে হল। এখন প্রথম কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা।

"কিন্তু ডুগান আর কার্ভালোর আগে তা কি আমি পারব?

"ছদ্মবেশ চেহারায় আসা আসল আসামীকে তারা ঠিকমতো চিনতে না পেরে থাকলেও সে যে তিনজনের একজন, এ বিষয়ে তো তাদের কোনও সন্দেহ নেই। আমি যখন বিশেষ একজনকে খুঁজব, তাদের তখন পর-পর তিনজনের পেছনে লেগে থেকে আসল ধুরন্ধরকে খুঁজে বার করতে হবে।

"কিন্তু তিনজনের বেশি চারজন তো নয়। ভাগ্য একটু সদয় হলে আমার আগেই তারা আসল লোককে পাকড়াও করতে পারবে নাই বা কেন?

"যাকে আসল আসামী বলে চিনে ফেলেছি বলে আমার ধারণা, তাকে খুঁজে বার করাও আমার পক্ষে মোটেই সোজা নয়। তার ছদ্ম-চেহারাটাই আমি দেখেছি। সেই ছদ্ম-চেহারা যদি সে এখন চটপট পালটে না-ও ফেলে থাকে, তা হলেও তার আস্তানা খুঁজে বার করে তার সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগের ব্যবস্থা করার কী উপায় আছে?

"ভাগ্য একটু সহায় বলে সেই উপায়ই হল। কার্ভালো আর ডুগান হন্যে হয়ে যাকে খুঁজছে, খুব বেশিদিন সে বিলেতে এসে নামেনি। হিথরোতে নেমেই সম্ভবত লকনেসের রহস্যের টানে ইনভারনেসে রওনা হলেও সেটা মাস-খানেকের চেয়ে বেশি আগের ব্যাপার হতে পারে না। কার্ভালোদের শিকারের খোঁজ করতে হলে ইনভারনেসের গোনাগুনতি ছোট-বড় হোটেলের রেজিস্টারে মাস-দেড়েকের মধ্যে আসা-যাওয়া বোর্ডারদের পরিচয়গুলো সংগ্রহ করতে হয়। আসল আসামীর সে পরিচয় মিথ্যে হলেও তার হোটেলের বোর্ডার হওয়ার তারিখটা থেকে যা

জানবার তা আঁচ করা যেতে পারে।

"হোটেলের বদলে আমার মতো বাসা ভাড়া করা মক্কেলের খবর এভাবে পাওয়া যাবে না জেনেই প্রথম দুটো বড় হোটেলে গিয়ে খোঁজ করতেই ভাগ্যের জোরে আসল মক্কেলেরই খোঁজ পেলাম বলে মনে হয়। এ-হোটেলে ঠিক মাস-দেড়েক আগেই এই মক্কেলটি এসে বোর্ডার হয়েছে। আরও অনেকের মতো লকনেসের রহস্যভেদই আসল নেশা হলেও, মানুষটার চালচলন একটু অদ্ভুত।

"এই মানুষটির সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনেই হোটেলের রিসেপশনিস্ট সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে যে, সেটা কোনওমতেই সম্ভব নয়। কারণ এই অদ্ভুত মানুষটি কারও সঙ্গে দেখা যে করেন না, যে-কোনও দর্শনপ্রার্থীকে সে-কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেবার নির্দেশ তিনি হোটেলের ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে রেখেছেন।

"যাকে খুঁজছি, এমন আশাতীত ভাবে তার সন্ধান পাওয়ার পর এরকম নিষেধের বেড়ায় বাধা পেয়ে কী করব তাই ভাবছি, এমন সময়ে আমার মক্কেলই স্বয়ং হোটেলের লবিতে ঢুকে কাউন্টার থেকে তাঁর স্যুইট-এর চাবিটা চেয়ে নিয়ে গেছেন।

"ভদ্রলোক হোটেলের কাউন্টারে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে হোটেল-ক্লার্কের কাছ থেকে তাঁর চাবিটা নিয়ে গেলেও সে-সময়টায় তাঁর সঙ্গে কোনওরকম আলাপের চেষ্টা করিনি। তিনি লবি থেকে হোটেলের লিফটে তাঁর ওপরতলার স্যুইটে উঠে যাবার পর হোটেলেরই নিজস্ব ছাপ-মারা একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে তাতে যা লেখবার তা লিখে হোটেল-ক্লার্ককে সেটা ওপরে ওই ভদ্রলোকের কাছেই পাঠিয়ে দিতে বলেছি।

"একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েও হোটেল-ক্লার্ক একজন জ্যানিটরকে দিয়ে কাগজটা পাঠিয়ে যে-রকম মুখভঙ্গি করেছে, তাতে বোঝা গেছে, এ-চিঠির জবাবে আমার ওপরে যাবার ডাক আসবার কোনও আশাই নেই।

"কিন্তু ডাক সত্যিই এসেছে হোটেলের সকলকে অন্তত অবাক করে।

"আমি অবশ্য জানতাম যে, ডাক আসবেই। কারণ চিঠিতে আমি শুধু মৎস্যাবতারের শ্লোকের প্রথম লাইনটুকু সংস্কৃতে লিখে তার নীচে ইংরেজিতে লিখেছিলাম, 'সামনে দারুণ বিপদ। তবু হারের খেলায়

জেতার মন্ত্র শোনাতে এসেছি।'

"এ-চিঠি পাঠাবার খানিক বাদেই চিঠি যাঁকে লিখেছি, তাঁর হুকুম পেয়ে জ্যানিটর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নেমে এসে আমায় সঙ্গে করে ওপরের তলার স্যুইটে পৌঁছে দিয়েছে।

"স্যুইটটা সত্যিই শৌখিন। আমির-ওমরাহের থাকার মতো। সাজসরঞ্জাম আর মালপত্র দেখে বর্তমান দখলকারী বোর্ডারের চালচলন, অবস্থা আর চরিত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু হয়তো জানা যায়, কিন্তু সে-সব দিকে নজর না দিয়ে আমি সোজাসুজি প্রথম থেকেই আমার আক্রমণ শুরু করেছি।

"'দেখা করার অনুমতি দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ, পাব্‌লো জুহো···না, মাফ করবেন। নামটা যা নিয়েছেন, তা ঠিক যেন খাপ খাচ্ছে না। নামটার মান রাখতে চেহারাটা যা পাল্টাবার চেষ্টা করেছেন, তাতেও বড় গলদ থেকে গেছে। পাব্‌লো জুহো বলে নামটা তো নিয়েছেন ফিনিশ মানে ফিনল্যাণ্ডের লোকের। কিন্তু তার জন্যে ছদ্ম-চেহারা যা নিজেকে দিতে চেয়েছেন, তা তো একেবারে নামের সঙ্গে মিলছে না।

"'নামটা যাদের নিয়েছেন, সেই ফিনদের মাথার চুল প্রায়ই লালচে আর চোখের তারা কিছুটা বদামি সাধারণত হয় বটে, কিন্তু সত্যিকার ব্লঁদ যাকে বলে, সেই ঈষৎ লালচে ধপধপে ফরসা তারা কখনও হয় না। তা ছাড়া, ফিনরা বেশির ভাগই সুইডিশ বা নরওয়ের লোকের তুলনায় একটু বেঁটেখাটো হয়ে থাকে। চোখের তারা তাদের একেবারে নীলও কখনও হয় না।

"আপনি চোখের তারার রং লুকোতে বাদামি রঙের কনট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে খানিকটা ধোঁকা দিতে পেরেছেন সত্যি, মাথার সোনালি চুলেও বেশ একটু লালচে ছোপ ধরাতে পেরেছেন, কিন্তু লম্বা-পাতলা দেহটাকে বেঁটেখাটো করা তো ভোজবাজিতে ছাড়া সম্ভব হয় না। তার ওপর মুখ আর হাত-পা'র খোলা জায়গায় বেশ কয়েক পোঁচ পালিশ দিলেও ভেতরের পাকা ব্লঁদ মানে দুধে-আলতা আভাকে একেবারে চাপা দেওয়া যায়নি।

"'শুনুন পাব্‌লো জুহো, আসল নাম আপনার যাই হোক, আপাতত পাব্‌লো জুহো নামেই আপনাকে ডেকে বলছি, এই নাম বদলে ছদ্ম-চেহারা

নিয়ে আপনার লাভ কী হচ্ছে ? সাধারণ গোলা লোককে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন, তাদের আপনার আসল নাম আর পরিচয় নিয়ে মাথাব্যথা থাকবারও কথা নয়। কিন্তু সত্যিকার কাজের কাজ তাতে আপনার কিছু হচ্ছে কি ?'

"বেশ ধৈর্য ধরেই ঘরের একটা সোফায় বসে আমার কথা শুনতে শুনতে মানুষটা হঠাৎ যেন খেপে গিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে কুকুর-তাড়ানোর মতো আমাকে তাড়া দিয়ে বললে, 'যান, যান, বেরিয়ে যান এ-ঘর থেকে। কে আপনি যে, আমায় আমার ঘরে ঢুকে যত বাজেকথা শোনাতে এসেছেন ! আমি যদি নাম ভাঁড়িয়ে থাকি, তা হলে সে আমার খুশি। আর কারও তাতে কী আসে যায় ?'

"'আর কারও নয়।' আমি গলাটা আগের চেয়ে নামিয়ে শান্ত স্বরে বলেছি, 'আসে যায় আপনারই। এবং কেন যায় তা আপনি ভাল করেই এখন জানেন। যাদের জন্যে নাম ভাঁড়িয়ে এমন করে লুকিয়ে বেড়িয়েছেন, তারা যে আপনার পেছনে এখনও কীভাবে লেগে আছে, আজ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনি পেয়েছেন। তারা অতরকম খুঁত থাকলেও ছদ্ম-চেহারায় আপনাকে চিনতে পারেনি ঠিকই, কিন্তু আজ না পারলেও কিছুদিন বাদেই তাদের চোখে ধুলো দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। কারণ আর কিছু না বুঝে থাক, যে তিনজন আজ তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেছল, তাদের আসল শিকার যে সেই তিনজনেরই একজন, এটুকু তারা ঠিকই এখন বুঝে ফেলেছে। সুতরাং এক-এক করে তিনজনকেই খুঁজে বার করবার জন্যে তারা যা কিছু করা সম্ভব তা করতে বাকি রাখবে না। ইনভারনেস লণ্ডন কি প্যারিসের মতো এতবড় শহর নয় যে, বাড়িঘর আর মানুষের ভিড়ের জঙ্গলে সেখানে চিরকাল না-ও যদি হয়, বেশ কিছুদিন অন্তত লুকিয়ে থাকা যায়। তা ছাড়া আপনাকে যারা খুঁজছে, তারা কী ধরনের মানুষ তা জানতে নিশ্চয় আপনার বাকি নেই। চটপট আপনাকে খুঁজে বার না করতে পারলেও তারা খোঁজায় ক্লান্ত হবে না। সহজে খোঁজ না পেলে তারা হন্যে হয়ে আপনার সন্ধানে যা কিছু সম্ভব তার কোনও ফন্দি খাটাতে বাদ রাখবে না। কিছুতে না পারলে তারা আপনার আসল পাসপোর্ট যে নামে আছে, সেই নামের যে মানুষ হঠাৎই এই ইনভারনেস শহরে আসার পর নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাকে খোঁজার

জন্যে পুলিশের সাহায্য চাইবে।

"'বিলেতের পুলিশ কী বস্তু, তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। কোনও কিছু নিয়ে হেলাফেলা করা তাদের কুষ্ঠিতে লেখেনি। সুতরাং মেকিয়াভেলির বুদ্ধি নিয়ে যত ফন্দিফিকিরের ওস্তাদই আপনি হন না কেন, এখানে থাকলে ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। আপনার একমাত্র বাঁচবার উপায় এখন এ-শহর ছেড়ে চলে যাওয়া।'

"'না, না।' মঁসিয়ে জুহো প্রায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, 'এ শহর ছেড়ে এখন আমি যেতে পারব না। এখান থেকে এখন চলে যাওয়া মানে বেঁচে থাকার আর কোনও মানেই না থাকা।'

"'কিন্তু এখানে কতদিন থাকতে পারবেন আপনার দুশমনদের দৃষ্টি এড়িয়ে? বেশিদিন যে পারবেন না, আর ওদের কছে ধরা পড়লে কী দশা যে আপনার হবে তা আপনি ভাল করেই জানেন।'

"'জানি, জানি।' মঁসিয়ে জুহো আমার দিকেই বিষদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সেই নরকযন্ত্রণার দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই পরিচয় আর চেহারা সবকিছু বদলাবার চেষ্টা করে এদেশে-ওদেশে গা-ঢাকা দিয়ে ফিরতে ফিরতে শেষে এইখানে এসে এমন একটা কিছু করবার পেয়েছি, যাতে রহস্যভেদ করতে পারলে একটা আশ্চর্য কীর্তির সঙ্গে নিজের নাম জড়িয়ে রেখে যেতে পারব।'

"'আমি যদি বলি এখান থেকে আপনি আর-এক বিশেষ জায়গায় চলে গেলেই সে আশ্চর্য কীর্তি আপনার নামের সঙ্গে জড়িত হতে বাধ্য?'

"'তা হলে বলব,' মঁসিয়ে জুহো বেশ একটু তেতোগলায় বললেন, 'আমায় ছেলেভোলানো ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করছেন। শুনুন, আশ্চর্য কীর্তি বলতে কিসের কথা বলছি তা আপনি নিশ্চয় কিছুটা বুঝেছেন, তবু আমি কতদূর যে এগিয়েছি তা আপনি কেন, এ-কাজে যারা মেতে আছে তারা কেউ বোধহয় কল্পনাই করতে পারবে না।'

"এগিয়ে যাওয়াটা কতদূর আর কোথায়, তা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না। মঁসিয়ে জুহো নিজের উৎসাহের আবেগেই বলে চললেন, 'আমি যদি বলি, এতকাল ধরে এতবার লকনেসের মধ্যে জলচর দানবের মতো কিছু থাকার বহু প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কেন কেউ তার জীবন্ত একটা ছবি বা তার দেহের কিছু হাড়গোড়ও সংগ্রহ

করতে পারেনি ? কেন এতদিনে বংশবৃদ্ধির দরুন অন্তত শ'দেড়েক ওই প্রাণী লক্‌নেসে নিশ্চিত আছে বলে বিশ্বাস হলেও তাদের একটিকেও ঠিকমতো ধরাছোঁয়া যাচ্ছে না ? তারা যে আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও তারা কোন্ ভোজবাজিতে লকনেসের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে ? ধরাছোঁয়ার চেষ্টা হলেও এ-সমস্ত রহস্যের সঠিক উত্তর কী হতে পারে, তা কেউ এখনও কল্পনাও করতে পেরেছে কি ?'

"'তা বোধহয় পেরেছে !'

"'আমার কথায় চমকে উঠে মঁসিয়ে জুহো বেশ একটু অবিশ্বাসের সুরে কড়া গলায় জানতে চেয়েছেন, 'কে পেরেছে ? কে ?'

"যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, 'যদি বলি আমি ?'

"'আপনি ?' মঁসিয়ে জুহোর গলায় অবজ্ঞার সঙ্গে একটু বিস্ময়ও মেশানো, 'কী, কী বুঝছেন আপনি ? কী উত্তর পেয়েছেন ওই ধাঁধার ?'

"'আপনি যা পেয়েছেন, তা ছাড়া আর কিছু নয় বোধহয় ।' ইচ্ছে করেই মঁসিয়ে জুহোকে একটু জ্বালিয়ে বলেছি, 'ওই একটি ছাড়া ও রহস্যের সহজ ব্যাখ্যা আর কিছু আছে বলেই মনে হয় না ।'

"'কিন্তু ব্যাখ্যাটা কী ?' জুহো জ্বলে উঠেছেন, 'কী আপনি বুঝেছেন, সেইটে স্পষ্ট করে বলুন না !'

"স্পষ্ট করে বলতে হলে,' যেন অত্যন্ত সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে হচ্ছে এমনভাবে বলেছি, 'আর কিছু নয়, উত্তরটা শুধু এই যে, লকনেস নামে হ্রদটার বাইরের মাপ লম্বায় চল্লিশ মাইল হলেও আসল মাপ খুব সম্ভবত আরও অনেক বেশি । বাইরে যা দেখা যায়, তা বাদে এই হ্রদ পাতাল-সাগর হয়ে এই ইনভারনেস অঞ্চলের পাহাড়ি উপত্যকার নীচে বহুদূর পর্যন্ত গভীরভাবে ছড়িয়ে আছে । ওপরে যে হ্রদ আমরা দেখতে পাই, তার সঙ্গে সেই পাতালহ্রদের যোগাযোগ আছে ঠিকই, কিন্তু তা খুঁজে বার করতে হলে সমস্ত হ্রদটাই তন্নতন্ন করে জরিপ করতে হয় বলে তা আপনার আমার তো নয়ই, মার্কিন ধনকুবেরদেরও সাধ্য যদি বা হয়, শখ করে মেতে ওঠবার মতো কাজ হবে বলে মনে হয় না । তা ছাড়া আদ্যিকালের এক আজগুবি জানোয়ার সত্যি এখনও আছে কি নেই, তার প্রমাণ পাবার জন্যে ব্রিটিশ সরকার তার দেশের পাহাড়-জঙ্গল অমন খোঁড়াখুঁড়ি করে তছনছ করার অনুমতি দেবে বলেও মনে হয় না ।'

"মঁসিয়ে জুহোর মুখটা বেশ একটু করুণ হয়ে এসেছে, তা লক্ষ করে এবার বললাম, 'না মঁসিয়ে জুহো, আপনার বৈজ্ঞানিক অনুমানটা যত সঠিকই হোক, নেহাত অচল টাকায় কেনা লটারির টিকিটে ডার্বি সুইপ পাওয়ার মতো ভাগ্যের অবিশ্বাস্য কৃপা না হলে বাকি জীবনভর আগাগোড়া লকনেসের বুকে ডুবুরি হয়ে খুঁজলেও পাতাল-সাগরের সঙ্গে কোথায় তার যোগাযোগ হয়েছে তা খুঁজে পাবেন না। আর খুঁজে পেলেও বা লাভ কী হবে ? পাতাল-সাগরের খোঁজ পেলেই সেখান থেকে জ্যান্ত কি মরা, বাচ্চা কি বুড়ো লকনেসের জলচর দানব ধরে আনতে পারবেন কি ? না, তা পারবার একমাত্র উপায় আমি যা পরামর্শ দিচ্ছি তা অগ্রাহ্য না করা। শুনুন মঁসিয়ে জুহো, লকনেসের রহস্য চিরকালের মতো যথার্থই ভেদ করবার গৌরব যদি না-ও চান, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ইনভারনেস থেকে সম্ভব হলে এই মুহূর্তে আপনার চলে যাওয়া একান্ত দরকার। যাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনাকে এমনভাবে এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছি, তাদের আসল পরিচয় আপনি আমার চেয়ে ভাল করেই জানেন। ভারতবর্ষের জঙ্গলে কেঁদো বাঘেরা পর্যন্ত যাদের অন্তত ক্রোশখানেকের ফাঁক রেখে এড়িয়ে চলে, সেই জংলি কুকুরের পালের চেয়ে এরা বুঝি ভয়ানক। একবার নিজেদের দাঁতের কামড় যার ওপর এরা বসিয়েছে, তার আর রক্ষে নেই। এরা তাকে...'

"'জানি, জানি।' আমার কথার মাঝে যেমন অধৈর্যের সঙ্গে তেমনি ভীত গলায় মঁসিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব আমি জানি। তবু বলছি, আপনি দয়া করে থামুন। আমার এখানে থাকা মানে যদি ওই শয়তানদের হাতে আবার পড়া হয়, তা হলে আমার এখন এখান থেকে পালানো মানেও এমন এক হার মানা, যার পর বাঁচবার কোনও মানেই আর থাকে না। না, না। কোথাও আমি এখন আর কিছুতেই যাব না। ওরা জংলি কুকুরের পালের মতো আমায় খুঁজছে এটা ঠিকই, কিন্তু তবু আমায় এখনও তো ধরতে পারেনি। আজ বলতে গেলে ওদের নিজেদের বাসা থেকেই নিরাপদে আমি ঘুরে এসেছি। আপনি আমার ছদ্মবেশের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু সে-ক্ষমতা ওদের হয়নি। এমনি করে আর ক'টা দিন যদি আমি ওদের হাত এড়িয়ে থাকতে পারি, তা হলে লকনেসের রহস্য হয়তো সত্যিই আর অজানা থাকবে না। আর তা যদি আমার দ্বারা সম্ভব

হয়, তা হলে জংলি কুকুর কি বাঘ-সিংহের বদলে ওরা আমার কাছে নেংটি ইঁদুর হয়ে যাবে, তা কি বুঝতে পারছেন না ?'

"'তা পারছি।' হতাশভাবে মঁসিয়ে জুহোকে বোঝাবার চেষ্টা করে বললাম, 'কিন্তু পুরোপুরি লকনেসের রহস্য-ভেদের উপায় সত্যিই যদি আপনি পেয়ে যান, তার সময় যে কিছুতেই আপনি আর পাবেন না। ওরা আজ আপনাকে সামনে পেয়েও চিনতে পারেনি তা ঠিক, কিন্তু ওরা তো তাতেই হার মেনে এখান থেকে চলে যাবে না। এরা এইটুকু নিশ্চিত জানে যে, আর যে তিনজন ওদের সঙ্গে দেখা করতে গেছল তাদের একজনই ওদের আসল শিকার। সেই একজনকে প্রথমে নিজেদের চেষ্টায় খুঁজে বার করতে না পারলে শেষ পর্যন্ত ওরা এখানকার ব্রিটিশ পুলিশের সাহায্য যে নিতে যাবে তাতে কোনও ভুল নেই।'

"'পুলিশের সাহায্য ?' একসঙ্গে আতঙ্ক আর সন্দেহ-মেশানো গলায় মঁসিয়ে জুহো বললেন, 'পুলিশের সাহায্য ওরা কী করে নেবে ? এদেশের পুলিশের নজর দেবার মতো কোন্ অপরাধ আমি করেছি ?'

"'না, তা করেননি,' দুঃখের সঙ্গেই জানালাম, 'তাই ওরা আপনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ জানিয়ে পুলিশের সাহায্য তো চাইবে না।'

"'তা হলে ?' রীতিমত অবাক আর সেইসঙ্গে আমার মাথার সুস্থতা সম্বন্ধে স্পষ্ট সন্দেহের সুর নিয়েই মঁসিয়ে জুহো জানতে চাইলেন, 'কী বলে ওরা এখানকার পুলিশের সাহায্য চাইবে ?'

"'চাইবে,' যতদূর সম্ভব সোজা করে কথাটা মঁসিয়ে জুহোকে বোঝাবার চেষ্টায় বললাম, 'ওদের তো বেশিকিছু হাঙ্গামা করতে হবে না। ওরা শুধু যে নামে বাইরের দুনিয়ায় এতকাল আপনি পরিচিত ছিলেন, সেইটি জানিয়ে আর আপনার আসল চেহারার একটা ফোটো দিয়ে পুলিশের কাছে জানাবে যে, তাদের সঙ্গী হিসেবে এই ইনভারনেসে আসার পথে আপনি হঠাৎ রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন। তাই তারা...'

"'না, না, না, না।' আমার কথার মাঝেই অস্থির উত্তেজনায় বাধা দিয়ে মঁসিয়ে জুহো বললেন, 'আমার আসল নাম, আসল চেহারা...এসব কী বলছেন আপনি ? পু...পুলিশ ওদের কথায় আমার খোঁজ করবে কেন ?'

"'একটু শান্ত হয়ে আমার কথাগুলো শুনুন মঁসিয়ে জুহো,' বেশ শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করলাম এবার, 'পুলিশ কোনওরকমে অপরাধী বলে

আপনার খোঁজ করবে না। আপনার দুশমনদের চাল সেদিক দিয়ে খুব পাকাই হবে। কিন্তু অপরাধী না হলেও হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়া মানুষকে খুঁজে বার করা তো পুলিশের একটা দায়। ওরা সেই দিক দিয়েই আপনার যথাসাধ্য খোঁজ করবে। তখন কেঁচো খুঁড়তে কী যে বার হতে পারে, তা আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়।'

"'না, না, না।' আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে একটু খাপছাড়া ভাবেই বলে উঠলেন জুহো, 'আমার আসল নাম কিছু নেই। আর এখানকার পুলিশ তা বার করতেই বা পারবে কী করে ? আর যদি বারই বা করে, তার ভয়টা কী আমার ? পুলিশ গ্রেফতার করে চালান দিতে পারে এমন কোনও কিছুর সঙ্গে সে-নাম কি জড়ানো ?'

"'না, তা নয়।' একটু দুঃখের হাসি হেসে বললাম, 'তবু ওই নামটা পচা খোলসের মতো খুলে ফেলে তার সঙ্গে যা কিছুর সংস্রব সব ছেড়ে দিয়ে নতুন একটা সুস্থ জীবন পাবার জন্যে আপনি দেশ-দেশান্তরে পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে এই লকনেসের রহস্যের দেশে এসে হাজির হয়েছেন। আর এর মধ্যে নানা জায়গায়, কে জানে কোন্ ফাঁকির কারসাজিতে গাদা করা রাশি রাশি টাকা নানা সৎ কাজে দান করে নিজের মনের গ্লানি খানিকটা ধুয়ে ফেলতে চেয়েছেন।'

"'হ্যাঁ,' জুহো এবার স্বীকার করেন, 'দুঃখী মানুষের উপকারের কাজে অনেক টাকা আমি নানা জায়গায় নিজের নামটুকু পর্যন্ত না জানিয়ে দান করেছি। তবে বিশ্বাস করুন, নানা জায়গায় দান যা করেছি তা কোনওরকম সাধারণ চুরি-ডাকাতি-জালিয়াতির টাকা নয়। সাধারণ বলছি এই জন্যে যে, পুলিশের হাতে ধরা পড়ে চোরাই মালের আসামী হবার মতো অপরাধ না হলেও তা এখনকার যুগের কোটিপতি শেঠেদের একরকম দুর্দান্ত জালিয়াতি। এ-জালিয়াতি কোনও আইনের শাসনে পড়ে না, কিন্তু টাকার জোরের সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের ধারালো বুদ্ধি থাকলে দুনিয়ার পয়সাকড়ির বাজার নির্ভয়ে নিজের খুশিমতো লুট করা যায়। বুদ্ধির সেরকম প্যাঁচালো ধার থাকলে টাকার জোরেরও দরকার হয় না! যেমন হয়নি আমার। ফাটকাবাজার যাকে বলে, দুনিয়ার সেই ব্যবসাদারির জুয়ার জগতের হাড়হদ্দ অতি সহজে বুঝে নিয়েই আমি সামান্য দু-চারটে নাড়াচাড়ার চালে যখন যেমন খুশি মুনাফা লুটতে পেরেছি। এ-কাজে
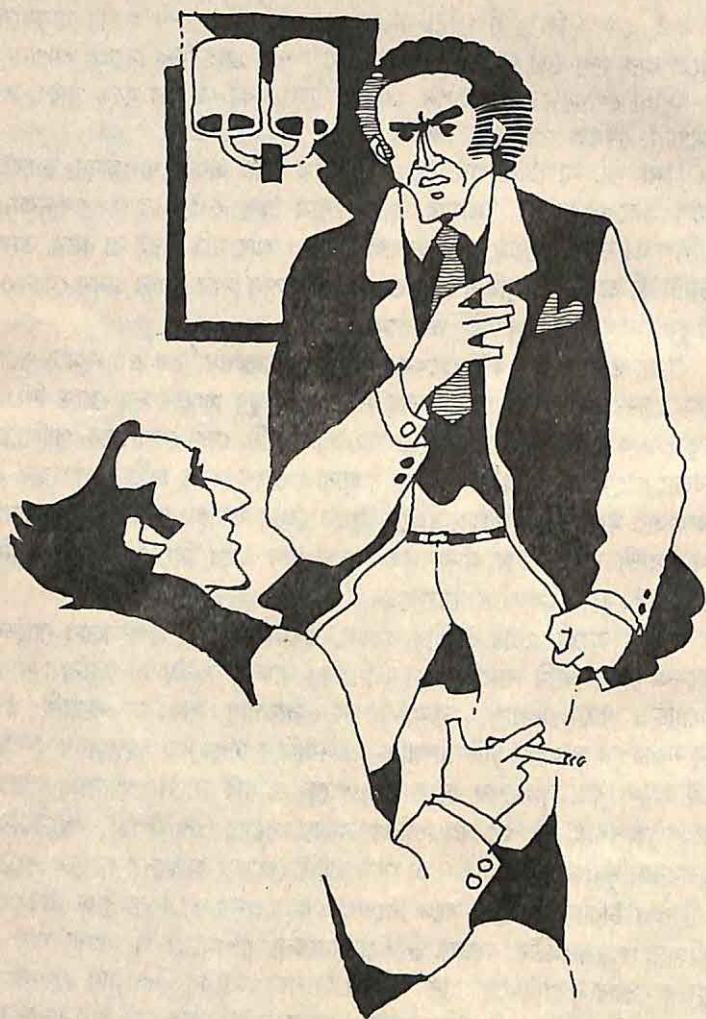
প্রথমে নামবার সময় আমার দুশমন বলে যাদের আপনি জেনেছেন, সেই দু'জনের সঙ্গে আমায় নিয়ম রাখতেই জোট বাঁধতে হয়েছিল। আমার বুদ্ধিতে এরপর অঢেল টাকা যখন উপায় হতে থাকে, তখন এই জোটের বন্ধন আমার গলায় ফাঁসি হয়ে ওঠে। আমার বুদ্ধিতে যত তাদের লাভের টাকা জমতে থাকে, তাদের লোভও বাড়তে থাকে তত। আমার তখন সমস্ত ব্যাপারটায় ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু আমি ছাড়তে চাইলেও তাদের ধুলো-মুঠোকে সোনা-মুঠো করবার পরশপাথর হিসেবে আমায় তারা কিছুতেই মুক্তি দেবে না। সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত নাম ভাঁড়িয়ে চেহারা লুকিয়ে এমন করে আমি পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। এই অবস্থায় লকনেসের রহস্যভেদের মতো অসামান্য কিছু করলে আমি আমার সব অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে মনে করে আবার সজ্জন মানুষের সমাজে মুখ দেখাতে পারব। আমি...'

"'শুনুন মিঃ গুস্তাভ নুটসন...' বলে বাধা দিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলাম, তা বলা আর হল না।

"'কী ? কী বললেন ? কী নাম ? গুস্তাভ নুটসন ?' এতক্ষণ মঁসিয়ে জুহো বলে যাঁকে ডাকছিলাম, তিনি প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'এ নাম আপনি কোথায় পেলেন ? এ কার নাম ?'

"'নাম আপনারই,' শান্তভাবেই জবাব দিলাম, 'আর এই-ই যে আপনার আসল নাম তা আপনি ভাল করেই জানেন। আপনার দুশমনদের এড়িয়ে পালিয়ে থাকবার জন্যে আপনি নাম আর চেহারা দুইই বদলেছেন, তবে নামটা বদলাবার একটা অন্য বড় কারণও আছে।'

"'কারণ ! অন্য কারণ...' বলে দু'বার ঢোক গিলে আমার প্রতিপক্ষ থেমে যাবার পর বেশ সহানুভূতির স্বরেই এবার বললাম, 'হ্যাঁ, মিঃ নুটসন, আপনার দুশমনদেরই ফরমাশে আপনাকে খুঁজে বার করতে গিয়ে আপনার সবকিছুই আমি জানতে পেরেছি। আপনি যা এইমাত্র আমায় শুনিয়েছেন, তার কিছুই মিথ্যে নয়। আপনি সত্যিই যে আপনার বিশেষ বুদ্ধির জোরে দেশ-বিদেশের কারবারি জগৎ তোলপাড় করে তুলে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা উপায়ের ব্যবস্থা করে দেন, আর শেষে এ-কাজে অরুচি শুধু নয়, সত্যিকার ঘেন্না ধরায় এ-জগৎ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন, সে সব কথাই সত্যি। কিন্তু যে-কথাটা আপনি এখনও বলেননি, তা হল এই যে, অনেক অনুরোধ

উপরোধ আর তারপর ভয়টয় দেখিয়েও আপনাকে নিজেদের কথায় রাজি করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ওরা একটা মিথ্যে জুয়াচুরির সাজানো মামলায় আপনাকে জড়িয়ে দেয়। সেই সাজানো মামলা মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্যে লড়বার ধৈর্যটুকুও না থাকায় আপনি তার দায় এড়াতে লুকিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।'

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' দুঃখে রাগে তিক্ত স্বরে বললেন গুস্তাভ নুটসন, 'সেই জন্যেই দেশে-দেশান্তরে এমন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি, আর সেই জন্যেই লকনেসের রহস্যভেদের মতো এমন একটা কিছু করতে চাইছি যার জোরে সত্যিকার সজ্জন সভ্য-সমাজে আমার কথা বুঝিয়ে বলতে পারার অধিকার পাব।'

"'পাবেন, পাবেন।' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে আমি বললাম, 'কিন্তু তার জন্যেই আপনাকে এখান ছেড়ে আমি যেখানে বলছি সেখানে চলে যেতে হবে...'

"'থামুন, থামুন।' নুটসন আবার যেন খেপে উঠলেন। 'বারবার শুধু আমায় এখান থেকে তাড়াবার চেষ্টা! এখান থেকে চলে যেতে হবে বললে চলে যেতে হবে! কোথায় যেতে হবে? কোথায়? আমায় এখান থেকে তাড়াবার পিছনে আপনার আসল মতলবটা কী বলুন তো? কী ধান্দায় আপনি আমার পেছনে ঘুরছেন?'

"'বলছি শুনুন।'

॥ ৮ ॥

একটু থেমে ঘনাদা বললেন, "কিন্তু বলা আর হল না। ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। রিসিভার তুলে দু'বার শুধু 'হ্যাঁ' বলে জবাব দিয়ে নুটসন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

"'উপায় নেই?' নুটসনের কথায় সত্যিই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, হয়েছে কী?'

"হঠাৎ ঝড়ে ওপড়ানো গাছের মতো একেবারে ভেঙে পড়ে ফ্যাকাশে মুখে নুটসন বললেন, 'ওরা এসে গেছে। নীচে হোটেলের কাউন্টারে এসে

আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে আমার অনুমতির অপেক্ষায় বসে আছে।'

"'আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি চেয়ে?' আমি যেমন অবাক তেমনি নুটসনের ওপর কিছুটা রেগেই বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ওরা চাইবে কী বলে? আপনার আসল-নকল কোনও নামই কি ওরা জানে? ওদের সঙ্গে আপনি যখন রহস্য-সংকেতের কাগজ নিয়ে দেখা করতে যান, তখন তো তাতে নামটাম নয়, শুধু আপনার দেখা করবার পাসের একটা নম্বর দেওয়া ছিল।'

"'হ্যাঁ, নামটাম নয়, শুধু তাই ছিল।' হতাশভাবে বললেন নুটসন, 'তাই ওরা এখানে এসে দারুণ চালাকি করেছে। নামটাম বলেনি। শুধু আমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলেছে যে, এই চেহারার একজন ভদ্রলোক খুবসম্ভব এই হোটেল থেকেই আজ সকালে তাদের সঙ্গে একটা বিশেষ কারণে দেখা করতে যান। তিনি যদি এই হোটেলেরই বোর্ডার হন, তা হলে তাঁর নিজেরই বিশেষ দরকারে এখনই তাঁর দেখা পাওয়া অত্যন্ত দরকার।'

"যেভাবে কথাগুলো বলা হয়েছে তাতে সন্দেহ করবার এমন কিছু নেই। হোটেলের কর্তারা তাই সরল বিশ্বাসে চেহারার বর্ণনা থেকে তাঁর নামটা বুঝে নিয়ে এইমাত্র ফোনে তাঁর কাছে দু'জন দর্শনপ্রার্থীকে পাঠাবার অনুমতি চেয়েছে।

"'বুঝলাম।' গম্ভীর হয়েই এবার বলেছি, 'আপনি কী বলেছেন তাতে?'

"'আমি...আমি...' হতাশ গলায় নুটসন বলেছেন, 'কী আর বলতে পারি আমি? ওদের লবিতে অপেক্ষা করতে বলে এখনই যাচ্ছি বলে জানিয়েছি।'

"একটু থেমে নিজের রঙ-করা লালচে চুলগুলো মুঠো করে যেন ছেঁড়ার চেষ্টা করে নুটসন পাগলের মতো বললেন, 'এখন...এখন আমার এই হোটেলের জানলা থেকে নীচে ঝাঁপ দিয়ে মরা ছাড়া আর কিছু করবার নেই।'

"'থামুন,' রীতিমত কড়া গলায় ধমক দিয়ে এবার বললাম, 'আপনার কাণ্ড দেখে আমি অবাক হচ্ছি। কারবারি দুনিয়াকে শুধু বুদ্ধির প্যাঁচে যে নাকানিচোবানি খাওয়ায়, আপনি যে সেই হিসেবের ভোজবাজির জাদুকর, এ-কথা আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। শুনুন, হাত-পা ছেড়ে চোখে অন্ধকার দেখার মতো কিছুই হয়নি। যা বলছি শুধু তাই করুন এখন। আপনি

নিজে ওদের সঙ্গে দেখা করতে নীচে যাবেন না। তার বদলে ওদেরই এখানে পাঠিয়ে দিতে বলুন আপনার হোটেলের কর্তাদের। আর...'

"'ওদের এখানে পাঠিয়ে দিতে বলব ?' আঁতকে উঠলেন নুটসন। তারপর...তারপর...বাঁচবার কোনও উপায় যে আর...'

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ, থাকবে।' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আপনার কোনও ভাবনা নেই। যা যা বলছি, শুধু তা-ই করুন। ওরা দু'জনে এখানে পৌঁছবার পর যেন অত্যন্ত খুশি হয়ে ওদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবেন, ভাল, ভাল। ভারতীয় জ্যোতিষের গণনা তা হলে শেষ হয়েছে ! ওরা কিছু বলবার আগেই অধীর আগ্রহে আবার বলবেন, বলুন, বলুন, গণনায় শেষ পর্যন্ত কী জানা গিয়েছে ? আমি এখনই আমার কর্তাদের জানিয়ে দেব।

"'নিজেরা জ্যোতিষ গণনার বিষয়ে কিছু বলতে না পেরে আপনার কর্তারা আবার কারা, তা ওরা জানতে চাইবে না নিশ্চয়। আপাতত আপনার নাম-ঠিকানাটা জানতে পারাই যথেষ্ট লাভ মনে করে আবোলতাবোল কিছু বলে ওরা বিদায় নেবে নিশ্চয়ই।'

"'কিন্তু তারপর ?' নুটসন হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর ওরা কি লক্‌নেসের জলে হাত-পা ধুয়ে ব্যাপারটায় দাঁড়ি টেনে চলে যাবে নিজেদের ধান্দায় ?'

"'না, তা যাবে না।' গম্ভীরভাবেই বললাম, 'তারপরেই বড় খেলা আরম্ভ বলতে পারেন। কিন্তু আপাতত এই প্রথম ফাঁড়াটা কাটিয়ে উঠুন তো ! নিন, ফোন করুন নীচের লবিতে। আমি ততক্ষণ এদিক-ওদিক একটু ঘুরে দেখি। কামরার ওধারে ওই বিরাট ওয়ার্ডরোবের ভেতরেই গিয়ে লুকোচ্ছি।'

"'ওয়ার্ডরোবের ভেতরে !' নুটসন বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু ওখানে যদি...'

"'না,' নুটসনকে আশ্বাস দিয়ে একটু হেসে বললাম, 'ওখানে ওরা খোঁজাখুঁজি করবে না। আর তা ছাড়া, ওয়ার্ডরোবের ভেতরে থাকা আমার একরকম অভ্যাসই হয়ে যাচ্ছে।'

"নুটসনের স্যুইটের এদিক-ওদিকে একটু ঘুরে যা দেখবার দেখে নিয়ে বিরাট ওয়ার্ডরোবটায় গিয়ে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করার কিছু

পরেই নুটসনের দুই দর্শনপ্রার্থীকে জ্যানিটর এই স্যুইটে পৌঁছে দিল।

"প্রথম দিকে যেমনভাবে বলে দিয়েছিলাম সেই মতোই আলাপ করে নুটসন তার দুই দুশমনকে বেশ একটু বেকায়দাতেই ফেলেছিল, কিন্তু তারপরই প্রসঙ্গটা বদলে তারা যে বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল, অপ্রস্তুত নুটসনের তাতে নিশ্চয় হাত-পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম হলেও আমি সেইরকম কিছুর জন্যে তৈরি হয়েই ছিলাম।

"নুটসনের মুখে আমার শেখানো প্রশ্ন ক'টার জবাব দিতে বেশ খানিক বিব্রত হয়ে হঠাৎ তারা ফাঁদের আসল ফাঁসটাই টেনে বসল।

"'কিছু যদি মনে না করেন,' শুঁটকো ডুগান তার প্যাঁচালো বুদ্ধিতে কথাগুলো শানিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার পাসপোর্টটা যদি একবার একটু দেখান!'

"'পাসপোর্ট?' নুটসনের হতভম্ব গলায় বিস্ময়ের সঙ্গে আতঙ্কটাও আর গোপন রইল না। 'পাসপোর্ট কেন?'

"'না, অন্য কিছু নয়,' শুঁটকো ডুগান আশ্বাস দিয়ে বললে, 'ওই জ্যোতিষের গণনার জন্যে আপনার পাসপোর্টের ক'টা নম্বর নাকি দরকার। তা পাসপোর্টটা দেখাতে আপনার আপত্তি কিছু...'

"ডুগানের কথা আর শেষ হল না। নুটসনের মুখে যে আতঙ্ক খানিক আগে থেকে ফুটে উঠেছে, সেই আতঙ্কেরই গাঢ় ছায়া তখন তার আর কার্ভালোরও মুখের ওপর।

"দু-তিন সেকেণ্ড কান খাড়া করে স্থির হয়ে বসে তারা লাফ দিয়ে উঠে স্যুইটের বাইরে এক জানলার ধার থেকে নীচে নেমে যাওয়া ফায়ার এস্‌কেপের দিকে ছুটে গেল।

"হ্যাঁ, সমস্ত হোটেলে তখন প্রচণ্ড শব্দে ফায়ার এলার্ম মানে আগুন লাগলে তা থেকে পালাবার জন্যে হুঁশিয়ারির সাইরেন বাজছে।

"গোলমেলে কিছু অবস্থা দেখা দিলে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার এই ফন্দি এঁটে আমি আগেই বৈদ্যুতিক তার-টার নেড়েচেড়ে তবেই ওয়ার্ডরোবে ঢুকেছিলাম।

"ফায়ার অ্যালার্ম বাজবার পর সমস্ত হোটেলে রীতিমত হুলুস্থুল যে পড়ে গেছল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রথম হইচই থামবার পর খোঁজাখুঁজি করে অবশ্য এরকম সাইরেন বাজবার কোনও কারণ খুঁজে

পাওয়া যায়নি। তবে বৈদ্যুতিক যোগাযোগের ত্রুটিতে এরকম ভুল হুঁশিয়ারি কখনও কখনও হয় বলেই এটাকে সন্দেহজনক কিছু বলে কেউ মনে করেনি।

"হোটেলের অন্য বোর্ডারদের সঙ্গে নীচের ফাঁকা জায়গায় নেমে তাদের ভিড়ের ভেতর থেকে লুকিয়ে নুটসন, ডুগান আর কার্ভালোর ওপর আমি নজর রাখতে যতটা সম্ভব কাছাকাছিই ছিলাম।

"সেদিনকার মতো নুটসনের কাছে বিদায় নিয়ে যাওয়ার সময় শেষ কথা তারা যা বলে গেল, সেইটি শোনার অপেক্ষাতেই অবশ্য আমি ছিলাম।

"হোটেলের এই গোলমালে সেদিনকার মতো চলে যাওয়া উচিত মনে করলেও তার পরের দিনই নুটসনের পাসপোর্টটা দেখতে আসবে বলে জানিয়ে গেল।

"আগুন লাগার মিথ্যে হুঁশিয়ারি সাইরেন নিয়ে হোটেলের শোরগোল ক্রমশ থেমে যাবার পর নুটসন তার স্যুইটে ফিরে গেলে সেখানে তার সঙ্গে দেখা করলাম।

"তার অবস্থা তখন প্রায় আধা-পাগলের মতো। একটা মাঝারি সাইজের স্যুটকেসে নেহাত দরকারি কিছু জিনিস খুঁজে-পেতে নেবার জন্যে সমস্ত কামরায় এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে-করতে আমায় দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'কী হল দেখলেন তো ? এখন এক্ষুনি এখান থেকে না পালালে নয়।'

"তার কথায় সায় দিয়ে বললাম, 'তা তো নয়ই। আর এইটিই তো চেয়েছিলাম।'

"চমকে আমার দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের সুরে নুটসন বললেন, 'চেয়েছিলেন মানে ? আজ রাত্রে এই অবস্থায় তাড়া-খাওয়া চোরের মতো আমি যাতে পালাই, তাই আপনি চেয়েছিলেন ? ওই ভুল সাইরেন বাজায় তা হলে আপনি খুশি ?'

"'নিজেই যার ব্যবস্থা করেছি, সরল ভাবেই বললাম, 'তাতে খুশি হব না ?'

"'তার মানে ?' নিজের কান দুটোকে ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না এমন বিমূঢ় গলায় নুটসন বললেন, 'ওই মিথ্যে সাইরেন বাজানোটা

আপনারই কারসাজি ?'

"'হ্যাঁ,' বাহাদুরিটা সানন্দে স্বীকার করে বললাম, 'ওটা আমার এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল বলতে পারেন। ঠিক সময়মতো ওটা বাজিয়ে একদিকে আপনার পাসপোর্ট দেখানোটা তখনকার মতো যেমন থামিয়ে রেখেছি, তেমনি আজ রাত্রেই যাতে আপনাকে ইনভারনেস ছেড়ে পালাতে হয় সে-ব্যবস্থাও করেছি ওই এক চালে।'

"'আপনি...আপনি...,' নুটসন রাগে প্রায় বাক্‌শক্তি হারিয়ে সেটা যতক্ষণে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন, সেই অবসরে নিজের কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বললাম, 'একবার পাসপোর্ট দেখবার বুদ্ধি যখন ওদের মাথায় এসেছে, তখন আজ না দেখবার সুযোগ পেলেও এই খোঁজে ওরা লেগে থাকবেই। নিজেরা না পারলে শেষ পর্যন্ত এখানকার পুলিশের কাছেই ওর একটা হারানো পাসপোর্ট খোঁজার জন্য সাহায্য চাইবে, আর সে পাসপোর্ট অন্য কারও নয়, আপনার আসল যা নাম সেই গুস্তাভ নুটসন নামে...। সুতরাং বুঝতেই পারছেন এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর আমার মতে এক্ষুনি আপনার না পালালে নয়। শুধু তাই নয়, পালিয়ে যেমন দুশমনদের হাত থেকে ছাড়া পাবেন, তেমনি যেজন্যে জীবনপাত করছেন, লকনেসের সেই রহস্যও ভেদ করতে পারবেন।'

"'সেই রহস্য ভেদ করতে পারব এখান থেকে পালিয়ে ?' এতক্ষণে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়ে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে নুটসন বললেন, 'আপনি কি নিজে উন্মাদ, না আমার সঙ্গে জড়ভরতের বুদ্ধি নিয়ে রসিকতা করছেন ? লকনেসের অজানা জলচর দানবের রহস্য এখানে এই ইনভারনেসে, আর আপনি বলছেন আমি তা ভেদ করার উত্তর পাব এখান থেকে পালিয়ে ? পালিয়ে যাব কোথায় ? শুধু পালালেই কার্যসিদ্ধি হবে ?'

"'না,' জোর দিয়ে বললাম, 'যেখানে হোক নয়, পালাতে হবে বিশেষ একটি জায়গায়।'

"'সেটা কোথায় ?' কোনওরকমে এক উন্মাদের সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য না হারিয়ে জিজ্ঞেস করলেন নুটসন।

"'সেটা ধরুন মাদাগাস্কারে।'

"'আমার কথায় এবার হোহো করে হেসে উঠে নুটসন বললেন, 'ঠিক, ঠিক ! ঠিক নিশানাই দিয়েছেন এবার। অবশ্য এর বদলে কামস্কাটকা কি

গুয়াতেমালাও বলতে পারতেন ?'

"'না,' গম্ভীর হয়েই এবার বললাম, 'গুয়াতেমালা কি কামস্কাটকা নয়, যেতে হবে ওই মাদাগাস্কার ছাড়া আর কোথাও নয়।'

"'বটে !' ঠিক উন্মাদকে প্রশ্রয় দেবার মতো গলায় নুটসন বললেন, 'তা শুধু ওখানেই কেন ?'

"'শুধু ওখানেই এই জন্যে যে,' আমি শান্ত গলায় ধীরে-ধীরে বললাম, 'যাকে নিয়ে লকনেসের রহস্য, সেই জলচর দানবটি পৃথিবীর আদ্যিকালের প্লিসিওসোরাসের বংশধর বলে বহু বৈজ্ঞানিক মনে করছেন। ফসিল মানে জীবাশ্মের প্রমাণে প্লিসিওসোরাসের বংশ যদিও বহু কোটি বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবু পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তনের কোটি-কোটি বছরের ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ জীবগোষ্ঠীর ধারার মধ্যে এরকম এক-আধটা ধারা প্রায় অমর হওয়ার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। লকনেসের বেলায় তাই যদি হয়ে থাকে। তা হলে তা চাক্ষুষভাবে প্রমাণ করবার উপায় ওই মাদাগাস্কারেই পাওয়া যেতে পারে।'

"'কেন, কেমন করে তা পাওয়া সম্ভব, তা বোঝাবার জন্য আমার সংকেত-লিপির সংস্কৃত শ্লোকটি আর একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—শ্লোকটির আরম্ভেই পাচ্ছি :

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্…
কেশব ধৃতমীনশরীর। জয় জগদীশ হরে।

"'একটা আশ্চর্য কথা একটু মন দিয়ে এবার শুনুন নুটসন। পৃথিবীর কোনও দেশের প্রাচীন শাস্ত্রে-পুরাণে যা নেই, আমাদের এই ভারতবর্ষের যোগী-ঋষি-সাধকেরা সভ্যতার উন্মেষের আগে কোন্ দিব্যদৃষ্টিতে সৃষ্টি তত্ত্বের সেই আভাস জানতে পেরেছিলেন। সেই দিব্যদৃষ্টির শক্তিতেই অবতার রূপে কল্পনা করে পর পর যে-সব জীবগোষ্ঠীর উদ্ভব ও প্রাধান্যের কথা তাঁরা বলে গেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানে সেইসব অনুমানই সঠিক বলে স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন ঋষিদের দিব্যদৃষ্টিতে প্রথম অবতার বলে যে জীবগোষ্ঠীর নাম করা হয়েছিল, তা হল মৎস্য। মৎস্যের পর এসেছে কূর্মের নাম ; তারপর অবতার রূপে কল্পনা করা হয়েছে বরাহের। বরাহের

পর নৃসিংহ ও বামনরূপী অবতারকে যেভাবে কল্পনা করা হয়েছে তাতেই আধুনিক বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ সন্ধানী সাধনার আবিষ্কারে তাঁরা কেমন করে পৌঁছেছিলেন, ভেবে অবাক হতে হয়।

"'অন্য সকলের কথা ছেড়ে দিয়ে প্রথম মৎস্যাবতারের কথাই ধরলে কোটি-কোটি বছর আগেকার প্লিসিওসোরাসই তার আদিরূপ ভাবলে বোধহয় খুব ভুল হয় না।

"'কালে-কালে নিজের সঙ্গী-সাথী আর ধারা একে-একে নির্বংশ হয়ে গেলেও লকনেসের বুকে একটি শাখা যদি কোনওরকমে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা পেয়ে থাকে, তা হলে কোনও গুপ্ত খাত দিয়ে ইনভারনেসের পাহাড়তলির তলায় কোনও বিরাট পাতাল-সাগরে পালিয়ে থাকবার যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তাদের একটি-দুটিকে অন্তত নির্ভুল চার আর টোপের প্রলোভনে বার করে এনে ধরা যেতে পারে। সে নির্ভুল চার আর টোপ বলতে কী বুঝব ? লকনেসের রহস্যময় জলদানবদের বহু কোটি বছর আগে বিলুপ্ত বলে ধরে নেওয়া যে জীবগোষ্ঠীর একটি অতি ক্ষীণ, আশ্চর্যভাবে টিকে থাকা প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, সেই প্লিসিওসোরাসের আহার ও বিচরণক্ষেত্র বলতে যা বোঝায় তাই বুঝব নিশ্চয়ই।

"'বহু কোটি বছর আগে যার মূলধারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সে প্রাণীর মনের মতো চেনা খাবার আর পরিবেশ কি এখন আর পাওয়া সম্ভব ?'

"'পরিবেশ না হোক, আহারটা পাওয়া সত্যিই যে অসম্ভব নয়, এইটিই এ যুগের পরমাশ্চর্য এক আবিষ্কার।

"'ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে হলে বলতে হয়, প্লিসিওসোরাস আমাদের ভারতীয় শাস্ত্র-পুরাণের আদি মৎস্যাবতার। অর্থাৎ সৃষ্টিতে জীব বিবর্তনের ইতিহাসে এই মৎস্যাবতারই আদি মনুর রক্ষক আর বাহন।

"'আদি মনুর বাহন বা রক্ষক সেই মৎস্যাবতারকে প্রলুব্ধ করে ধরবার জন্যে একমাত্র মান্ধাতার টোপই তা হলে প্রয়োজন।

"'কোথায় মিলবে সে মান্ধাতার টোপ ? তা পাওয়া কি সম্ভব ?

"'হ্যাঁ, সম্ভব। বহু কোটি বছর আগে বিলুপ্ত-প্রায় প্লিসিওসোরাসের একটি সমবয়সী জীবগোষ্ঠীর ধারা এখনও ক্ষীণভাবে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

"'চলেছে আর কোথাও নয়, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের মাদাগাস্কার দ্বীপের সমুদ্রে। কোটি-কোটি বছর ধরে একই চেহারা-চরিত্র আর দেহবৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা যে টিঁকে আছে মাদাগাস্কারের সমুদ্র উপকূলে গত দুই-তিন দশকে মৎস্য-শিকারিদের ছিপে আর জালে ধরা পড়া নিদর্শনে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে।

"'শুনুন, মিঃ নুটসন, এখন আর কোথাও নয়, এখান থেকে পালিয়ে সেই মাদাগাস্কারে গিয়েই একটি অন্তত জীবন্ত এই মান্ধাতার টোপ আপনাকে সংগ্রহ করে আনতে হবে।

"'আদি মনুর বাহন ও রক্ষক প্রথম মৎস্যাবতারের নাম যেমন প্লিসিওসোরাস, তাকে প্রলুব্ধ করে ধরবার এই মান্ধাতার টোপেরও বৈজ্ঞানিক নাম তেমনি হল 'সিলাকান্থ'।

"'এই সিলাকান্থের একটা-দুটো ছানাপোনা যদি কোনও রকমে সংগ্রহ করে এনে এই লকনেসের জলে ছাড়তে পারেন, তা হলে কী ভোজবাজি হয়ে যাবে তা বুঝতে পারছেন কি?

"'লকনেসের গহনে গভীরে আদি প্লিসিওসোরাস গোষ্ঠীর যে ক'টা যেখানেই এখনও টিকে থাকুক, দু-দশ হাজার নয়, অমন দশ-বিশ কোটি বছরের সঙ্গী থাকার স্মৃতির টানে আর কোনও কিছু নয়, শুধু একটু গা-ঘষাঘষির লোভেই তারা পিলপিল করে ছুটে আসবে। তখন একটু বুদ্ধি করে জাল ফেলার ব্যবস্থা করে তাদের একটা-আধটাকে ধরা তো কোনও সমস্যাই নয়।

"'শুনুন, কথায়-কথায় অনেক রাত হয়েছে, তবু আপনার বিশ্রামের অবসর আর নেই। হোটেল থেকে লুকিয়ে বার হয়ে আপনি সোজা গলিঘুঁজির পথে ইনভারনেস স্টেশন ইয়ার্ডে চলে যান। কোনও যাত্রী-ট্রেন সেখান থেকে এখন আর পাবেন না। কিন্তু আমি খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছি যে, একটি খালি মালগাড়ি সেখান থেকে মাঝ-রাত্রে ছেড়ে এডিনবরা পর্যন্ত যাবে। সেই মালগাড়ির একটা খালি ভ্যানে উঠে লুকিয়ে এডিনবরা পর্যন্ত চলে যান, তারপর সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজে, প্লেনে সোজা মাদাগাস্কার। ইচ্ছেমতো খরচ করবার যথেষ্ট টাকা জোগাড়ের ক্ষমতা আর উপায় যে আপনার আছে তা আমি ভাল করেই জানি। সুতরাং মাদাগাস্কারে গিয়ে জীবন্ত সিলাকান্থ ধরে আনতে যে

আপনি পারবেন, সে-বিশ্বাস আমার আছে। আপনার দুশমনেরা যে শেষ মুহূর্তে কোনও শয়তানি না করতে পারে, সেই পাহারায় আমি এখানে রইলাম। আপনি এক্ষুনি রওনা হয়ে যান।'"

ঘনাদা একটু থেমে আমাদের সকলের দিকে চেয়ে প্রসন্ন মুখেই বললেন, "ইনভারনেস থেকে নুটসনের বাজিমাতের টেলিগ্রামের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। খুব বেশি দেরি বোধহয় আর হবে না।"

—

জন্ম : বারাণসীতে । শৈশব ও প্রথম কৈশোর উত্তরপ্রদেশে ।
পড়াশুনা কলকাতা ও ঢাকায় ।
খেয়ালের বশে লেখা দুটি গল্প সে-কালের ডাকসাইটে 'প্রবাসী' পত্রিকায় পর পর দু-মাসে ছাপা হয় ।
সেই শুরু এবং শুরু থেকেই সাড়া-জাগানো ।
শিক্ষকতা, টালিখোলা-চালানোর চেষ্টা, পত্রিকা সম্পাদনা, ওষুধ কোম্পানির প্রচার বিভাগের কর্তা —বহু বিচিত্র জীবিকা ।
চলচ্চিত্রে চিত্রনাট্যকার- পরিচালক- প্রযোজক হয়েছিলেন । আকাশবাণীতে যুক্ত ছিলেন প্রথম প্রযোজক, পরে 'সাহিত্য শলাহ্‌কর' রূপে ।
প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দেড়শোর বেশী । কিশোর-সাহিত্যেও দারুণ জনপ্রিয় । সাহিত্যের সমস্ত শাখায় লেখনী তৎপর ।
আমন্ত্রণমূলক সফরে ঘুরে এসেছেন য়ুরোপ- আমেরিকা- রাশিয়া ।
অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন । এর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্র পুরস্কার, সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার, ভারত সরকারের শিশুসাহিত্য পুরস্কার, মৌচাক পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, সোভিয়েট দেশ নেহরু পুরস্কার, শরৎ মেমোরিয়াল পুরস্কার ।

প্রচ্ছদ দেবাশিষ দেব